আমাদের পৃথিবী

ষষ্ঠ শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রথম সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৩
দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৪
তৃতীয় সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৫
চতুর্থ সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৬
পঞ্চম সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৭

গ্রন্থস্বত্ব : পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রকাশক :
অধ্যাপিকা নবনীতা চ্যাটার্জি
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬

মুদ্রক :
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সটবুক কর্পোরেশন
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

सत्यमेव जयते

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি **সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র** রূপে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করছি এবং তার সকল নাগরিক যাতে : সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক **ন্যায়বিচার**; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার **স্বাধীনতা**; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের **সমতা** প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি-সম্ভ্রম ও জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুনিশ্চিত করে **সৌভ্রাতৃত্ব** গড়ে তুলতে; **আমাদের গণপরিষদে**, আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, **এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করছি, বিধিবদ্ধ করছি** এবং **নিজেদের অর্পণ করছি**।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens : JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all – FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

ভূমিকা

ষষ্ঠ শ্রেণির 'পরিবেশ ও ভূগোল' পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকটির নাম 'আমাদের পৃথিবী'। অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বইটিতে পরিবেশ আর মানবজীবনের পারস্পরিক সম্পর্কের নানা অভিমুখ আলোচিত হয়েছে। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯– নথিদুটিকে নির্ভর করে এই বৈচিত্র্যময় অভিনব পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-কে বিদ্যালয়স্তরের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলির সমীক্ষা ও পুনর্বিবেচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টায়, নিরলস শ্রমে পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি অনুযায়ী ষষ্ঠ শ্রেণির 'আমাদের পৃথিবী' বইটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

তথ্যভার যাতে শিক্ষার্থীকে উদ্বিগ্ন না করে সে বিষয়ে বইটিতে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ছবি, সারণি, তালিকা ব্যবহার করে ভূগোলের বিভিন্ন ধারণার সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটানো হয়েছে। আশা করি, রঙে রূপে চিত্তাকর্ষক এই বইটি শিক্ষার্থীমহলে সমাদৃত হবে।

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিষয় বিশেষজ্ঞ ও অলংকরণের জন্য খ্যাতনামা শিল্পীবৃন্দ—যাঁদের নিরন্তর শ্রম ও নিরলস চেষ্টার ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ বইটির নির্মাণ সম্ভব হয়েছে, তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের সমস্ত বিষয়ের বই ছাপিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকে। এই প্রকল্প রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন নানাভাবে সহায়তা করেন এবং এঁদের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।

'আমাদের পৃথিবী' বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য সকলকে মতামত ও পরামর্শ জানাতে আহ্বান করছি।

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়

প্রশাসক
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

ডিসেম্বর, ২০১৭
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১৬

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই বিশেষজ্ঞ কমিটির ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয় স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক- এর পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হলো। পুরো প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE Act, 2009) নথিদুটিকে আমরা অনুসরণ করেছি। পাশাপাশি সমগ্র পরিকল্পনার ভিত্তি হিসেবে আমরা গ্রহণ করেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শের রূপরেখাকে।

উচ্চ-প্রাথমিক স্তরে 'পরিবেশ ও ভূগোল' পর্যায়ভুক্ত বইগুলির মধ্যে ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক 'আমাদের পৃথিবী' প্রকাশিত হলো। এই পাঠ্যপুস্তকে 'ভূগোল' বিষয়টিকে মানবজীবন আর তার পরিবেশের নিরিখে পরিবেশন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর চেনা গণ্ডি অর্থাৎ তার বাড়ি, স্কুল, চারপাশের জগৎ থেকে ক্রমে ব্যাপ্ততর ভৌগোলিক ধারণার মধ্যে ধাপে ধাপে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নানা ধরনের হাতেকলমে কর্মচর্চার মাধ্যমে যাতে শিক্ষার্থীর কাছে ভূগোলের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়গুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। নানান সরল মানচিত্র, বৈচিত্র্যে ভরা ছবি, ধারণা গঠনের লেখচিত্র, তথ্যমৌচাক প্রভৃতি অভিনব শিখন সম্ভারে বইটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে সামগ্রিক নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের (CCE) নানা ক্ষেত্র বইটিতে বিদ্যমান। সেসব সমীক্ষা আর সক্রিয়তা উত্তেজনা আর আনন্দে ভরপুর। আশা করি, ভূগোলের ধারণাগুলি শিক্ষার্থীর কাছে এইভাবে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা নির্ভর হবে। তাদের ব্যাখ্যা করার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে। বইয়ের শেষে 'শিখন পরামর্শ' অংশে বইটির ব্যবহার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রস্তাবও মুদ্রিত হলো।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পাঠ্যপুস্তকটিকে অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভৃত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করবো।

অভীক মজুমদার

ডিসেম্বর, ২০১৭
নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০ ০৯১

চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

পুস্তক নির্মাণ ও বিন্যাস

রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্যসচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

অপর্ণা বেরা রায়চৌধুরী

বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরী

শান্তনু প্রসাদ মণ্ডল

রুবি সরকার

অনিন্দিতা দে

শক্তি মণ্ডল

শুভনীল গুহ

পরামর্শ ও সহায়তা

সুস্মিতা গুপ্ত

পুস্তক সজ্জা

প্রচ্ছদ : সুব্রত মাজি

অলংকরণ: প্রণবেশ মাইতি,

মুদ্রণ সহায়তা: বিপ্লব মণ্ডল

সূচিপত্র

১। আকাশ ভরা সূর্য তারা (১)

২। পৃথিবী কী গোল (১৫)

৩। তুমি কোথায় আছ (১৯)

৪। পৃথিবীর আবর্তন (২৪)

৫। জল-স্থল-বাতাস (৩০)

৬। বরফে ঢাকা মহাদেশ (৩৯)

৭। আবহাওয়া ও জলবায়ু (৪৪)

৮। বায়ুদূষণ (৫৫)

৯। শব্দদূষণ (৬২)

১০। আমাদের দেশ ভারত (৬৫)

১১। মানচিত্র (১০৩)

আকাশ ভরা সূর্য তারা

সন্ধেবেলা খোলা জায়গায় আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখো... আকাশ ভরা ঝিকমিকে তারা! যেন একটা কালো চাঁদোয়ার গায়ে ছোটো ছোটো ফুটো করা আছে। সেগুলো দিয়ে ঝিকমিক করছে অসংখ্য আলোর বিন্দু!

দিনের বেলায় সূর্য আর রাতের আকাশে চাঁদ সহ অসংখ্য আলোকবিন্দু হলো জ্যোতিষ্ক। কোটি কোটি জ্যোতিষ্ক অর্থাৎ গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, গ্রহাণুপুঞ্জ, ধূলিকণা, গ্যাস প্রভৃতি রয়েছে অসীম শূন্যস্থানে **(Space)**। এই সমস্ত কিছু নিয়েই হলো মহাবিশ্ব **(Universe)**।

মহাবিশ্ব

মানুষ শুরু থেকেই আশ্চর্য হয়ে মহাবিশ্বের সৃষ্টির কথা ভেবেছে। মহাবিশ্বের সৃষ্টি নিয়ে বহু মতভেদ আছে। এরকম এক আধুনিক মত অনুযায়ী মহাবিশ্বের সমস্ত পদার্থ একটা বালির কণার থেকেও ছোটো অবস্থায় ছিল। প্রায় ১৪০০কোটি বছর আগে তার প্রসারণ শুরু হয়। প্রচুর তাপ আর অকল্পনীয় শক্তি ছড়িয়ে পড়ে। সেইসঙ্গে প্রচুর ধূলিকণা ও গ্যাসের মহাজাগতিক মেঘ সৃষ্টি হয়। কোটি কোটি বছর ধরে এই ধুলোর মেঘ, গ্যাস থেকে তৈরি হয় অসংখ্য নীহারিকা, ছায়াপথ, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, উল্কা প্রভৃতি। মহাবিশ্বের সবকিছুই চলমান অবস্থায় আছে এবং ক্রমাগত একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সীমাহীন মহাবিশ্ব ঠিক কতদূর বিস্তৃত তা মানুষের কল্পনার বাইরে। আমরা অর্থাৎ পৃথিবীর মানুষ মহাবিশ্ব সম্বন্ধে খুব সামান্যই জানতে পেরেছি।

> এখন আমরা যেমন তারাভরা রাতের আকাশ পর্যবেক্ষণ করি, হাজার হাজার বছর আগেও মানুষ চাঁদ, সূর্য, তারা, ছায়াপথ, ধূমকেতু, উল্কা পর্যবেক্ষণ করে তাদের সম্পর্কে জানবার চেষ্টা করত। বিজ্ঞানের সবচেয়ে পুরোনো এই চর্চা হলো '**জ্যোতির্বিজ্ঞান**'। চাঁদ, সূর্য, তারার চলাফেরা দেখে দিক ঠিক করা হতো কিংবা দিন, মাস, বছর, সময় গণনা - সবই হতো আকাশ দেখে। কম্পাস, ঘড়ি, ক্যালেন্ডারের কাজ করত আকাশ!

নীহারিকা

মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময় যে অসংখ্য ধূলিকণা ও গ্যাসের মহাজাগতিক মেঘ তৈরি হয় তা হলো নীহারিকা **(Nebula)**। এই নীহারিকা থেকেই তারা বা নক্ষত্রের জন্ম হয়। মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রায় দশ লক্ষ বছর পরে গ্যাসীয় পদার্থগুলো জমাট বাঁধতে শুরু করে। আর তাদের মধ্যে মধ্যে তৈরি হতে থাকে শূন্যস্থান। জমাট বাঁধা পদার্থগুলো প্রচণ্ড গতিতে একে অপরের সঙ্গে মিলে গিয়ে প্রকাণ্ড আকারের জ্বলন্ত নক্ষত্রের জন্ম দেয়।

ছায়াপথ

আকাশগঙ্গা

লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র নিয়ে এক একটা **ছায়াপথ (Galaxy)** তৈরি হয়। সূর্য, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ এরকমই **আকাশগঙ্গা (Milky way)** নামে পরিচিত একটা ছায়াপথে রয়েছে। ছায়াপথগুলো প্যাঁচানো, ডিম্বাকার ইত্যাদি নানা রকম আকৃতির হয়। প্রায় ১০ হাজার কোটি নক্ষত্র, গ্যাস, ধূলিকণা নিয়ে আকাশগঙ্গা একটা বিরাট প্যাঁচানো ছায়াপথ। খালি চোখে রাতের আকাশে যত তারা দেখা যায় সবই আকাশগঙ্গা ছায়াপথের তারা।

নক্ষত্র

নক্ষত্র

আকাশভরা তারাগুলো কতই না বিচিত্র! ছোটো বড়ো নীলচে হলদে সাদা কতগুলো একা একা আবার কতগুলো একসঙ্গে ঝাঁক বাঁধা। এই তারা বা নক্ষত্র (Star) একটা জ্বলন্ত গ্যাসীয় পিণ্ড যাদের নিজস্ব আলো ও উত্তাপ আছে।

তারার রং

কোন তারা কতটা উত্তপ্ত, রং দেখে বোঝা যায়। ছোটো লাল তারার উষ্ণতা সবথেকে কম। আকাশে এরকম তারার সংখ্যা সবথেকে বেশি। মাঝারি হলুদ তারার উষ্ণতা আর একটু বেশি। বিরাট নীল তারার উষ্ণতা প্রচণ্ড বেশি, এবং বেশ উজ্জ্বল। আর প্রকাণ্ড সাদা তারার উষ্ণতা এবং উজ্জ্বলতা দুটোই সবথেকে বেশি। খালিচোখে আমরা এই তারাগুলোকেই দেখতে পাই।

• বাড়ির কাছাকাছি কোনো প্ল্যানেটারিয়াম (Planetarium) গিয়ে দেখে এসো। কৃত্রিমভাবে মহাকাশ, গ্রহ, তারা— সবকিছু দেখতে পাবে।

প্ল্যানেটারিয়াম

একটা কালো আর্ট পেপারে আঠা লাগিয়ে তার ওপর অভ্র ছড়িয়ে বানিয়ে ফেলো নানারকম ছায়াপথ।

তারারা আছে ‘আলোকবর্ষ’ দূরে --

তারারা কোটি কোটি কিলোমিটার দূরে রয়েছে। সূর্যের পরেই আমাদের সবথেকে কাছের তারা প্রক্সিমা সেনটাউরি রয়েছে প্রায় ৪১ লক্ষ কোটি কিমি দূরে। সে তুলনায় সূর্য অনেক কাছে আছে, দূরত্ব মাত্র ১৫ কোটি কিমি। তাই সূর্যকে বড়ো আগুনের থালার মতো দেখায়। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো পৌঁছোতে সময় লাগে ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড। অর্থাৎ বায়ুশূন্য অবস্থায় আলোর গতিবেগ ১ সেকেন্ডে প্রায় ৩০০,০০০ কিমি। এই গতিবেগে ১ বছরে আলো যতটা দূরত্ব পার হয়, তা হলো এক **আলোকবর্ষ (Light year)**। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের বিভিন্ন নক্ষত্র, ছায়াপথের দূরত্ব এই ‘আলোকবর্ষ’ এককে পরিমাপ করেন। এই এককে প্রক্সিমা সেনটাউরি -র দূরত্ব পৃথিবী থেকে ৪.২ আলোকবর্ষ।

বকমণ্ডল

নক্ষত্রমণ্ডল

কাছাকাছি থাকা তারাগুলোকে কাল্পনিকভাবে যোগ করলে বিভিন্ন আকৃতি তৈরি হয়। এরকম এক একটা তারার ঝাঁককে বলে **‘নক্ষত্রমণ্ডল’** (Constellation)। এই সম্পর্কে কত রূপকথা, কল্পকাহিনি ভেবেছে মানুষ। উত্তর আকাশে সাতটি উজ্জ্বল তারা— আমরা যাকে বলি **‘সপ্তর্ষিমণ্ডল’**। আকাশের অন্যদিকে আছে ইংরাজি ‘M’ অক্ষরের মতো **‘ক্যাসিওপিয়া’**। ক্রুশচিহ্নের মতো **‘বকমণ্ডল’** আর অপূর্ব সুন্দর নক্ষত্রপুঞ্জ **‘কালপুরুষ’**কে কল্পনা করা হয়েছে পুরাকাহিনির এক সাহসী শিকারি রূপে।

দিনের বেলা তারা দেখা যায় না কেন?

এক টুকরো কালো কাগজে পেন দিয়ে গেঁথে কয়েকটা ফুটো করো। এবার কাগজটা টর্চের মুখে আটকে দাও। অন্ধকার ঘরের দেয়ালে টর্চের আলো ফেলে দেখো। আলোর বিন্দুগুলো তারার মতো দেখাবে। এই অবস্থায় ঘরের আলো জ্বেলে দাও। তারাগুলো উধাও!

তারাগুলো মিটমিট করে কেন ?

আমাদের পৃথিবীর চারদিকে বায়ুমন্ডল আছে। পৃথিবী থেকে বহু দূরে থাকা তারার আলো যখন এই বায়ুস্তর পেরিয়ে আসে তখন কেঁপে যায়। পৃথিবীর বায়ুস্তরের বাইরে মহাকাশ থেকে তারাদের দেখলে স্থির আলোর বিন্দুর মতোই দেখায়।

তারা চেনার মজা !

অমাবস্যার রাতে ছাদে বা খোলা আকাশের নীচে কোথাও মাদুর পেতে বসে পড়ো, ইচ্ছে হলে বন্ধুদের বা বড়োদেরও সঙ্গে নিতে পারো। মাথার ওপর আকাশভরা তারা গুনে শেষ করতে পারবে? খালি চোখে মাত্র ৬,০০০-এর মতো তারা দেখা যায়। ভালো করে লক্ষ করলে হয়তো সাদা মেঘের মতো আকাশগঙ্গা ছায়াপথকে দেখতে পাবে। 'ধ্রুবতারা' আর 'সপ্তর্ষিমণ্ডল'কে তো দেখতে পাবেই। উত্তর আকাশের উজ্জ্বল তারা 'ধ্রুবতারা'। বহুকাল ধরে 'ধ্রুবতারা' দেখেই রাত্রিবেলা নাবিকরা, অভিযাত্রীরা 'উত্তর' দিক ঠিক করত। শীতকাল হলে পরিষ্কার রাতের আকাশে খুব সহজেই চোখে পড়বে 'কালপুরুষ', 'কৃত্তিকা' অথবা অন্য কোনো নক্ষত্রমণ্ডল।

সপ্তর্ষিমণ্ডল

টেলিস্কোপ কী?

রাতের কালো আকাশে হাজার হাজার তারাকে শুধুই কতকগুলো আলোর বিন্দু মনে হয়। তাহলে পৃথিবীতে বসে মানুষ কীভাবে মহাকাশ সম্বন্ধে এত কিছু জানতে পারল?

আকাশ দেখার জন্য কাচ লাগানো বিশাল চোং (দূরবিন বা টেলিস্কোপ) দরকার হয়। প্রতিটা টেলিস্কোপের জন্য তৈরি করতে হয় বিরাট গোলাকার গম্বুজ, যাকে 'মানমন্দির' (Observatory) বলে। শক্তিশালী টেলিস্কোপ-এর মাধ্যমে দুশো কোটি আলোকবর্ষ দূরের তারাও দেখা যায়।

খুদে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মজার খেলা

সংখ্যা অনুযায়ী পরপর তারাগুলোকে রেখা দিয়ে যোগ করো। এক একটা নক্ষত্রমণ্ডলকে নিজের মতো করে নাম দাও।

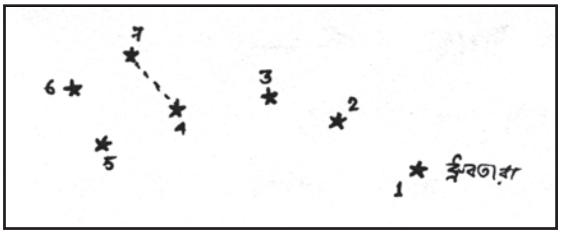

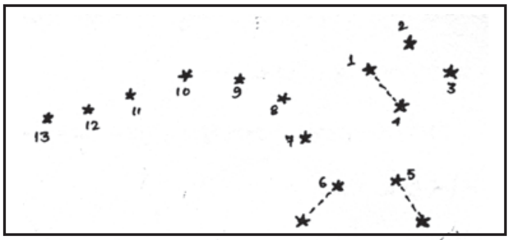

এঁকেই ফেলো

রাতের আকাশে যেখানে যতগুলো নক্ষত্রমণ্ডল দেখেছো তার একটা ছবি এঁকে ফেলো। তাতে যেন অবশ্যই **'ধ্রুবতারা'** থাকে।

সৌরজগৎ বা সৌরপরিবার

আকাশগঙ্গার লক্ষ কোটি তারার মধ্যে একটি মাঝারি হলুদ তারা হলো সূর্য। প্রায় ৪৬০ কোটি বছর আগে মহাশূন্যে ভাসমান ধূলিকণা, হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসের বিশাল মেঘ সংকুচিত হয়ে জমাট বেঁধে তৈরি হয় সূর্য। সদ্য জন্মানো নক্ষত্রে মহাকর্ষের কারণে পরমাণু পরমাণুতে ধাক্কা লেগে প্রচণ্ড তাপ আর শক্তি তৈরি হয়। এর ফলে জ্বলন্ত আগুনের গোলার মতো সূর্য থেকে আলো, উত্তাপ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। অবশিষ্ট ধূলিকণা, গ্যাস সূর্যের আকর্ষণে সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এই ধুলোর মেঘ থেকে তৈরি হয় পৃথিবী ও অন্য গ্রহ, উপগ্রহ। এই সবকিছু নিয়েই সৃষ্টি হয় সৌরজগৎ (Solar System) বা সৌরপরিবার যার কেন্দ্রে অবস্থান করছে স্বয়ং সূর্য। সূর্যকে ঘিরে গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ প্রভৃতি প্রদক্ষিণ করে চলেছে।

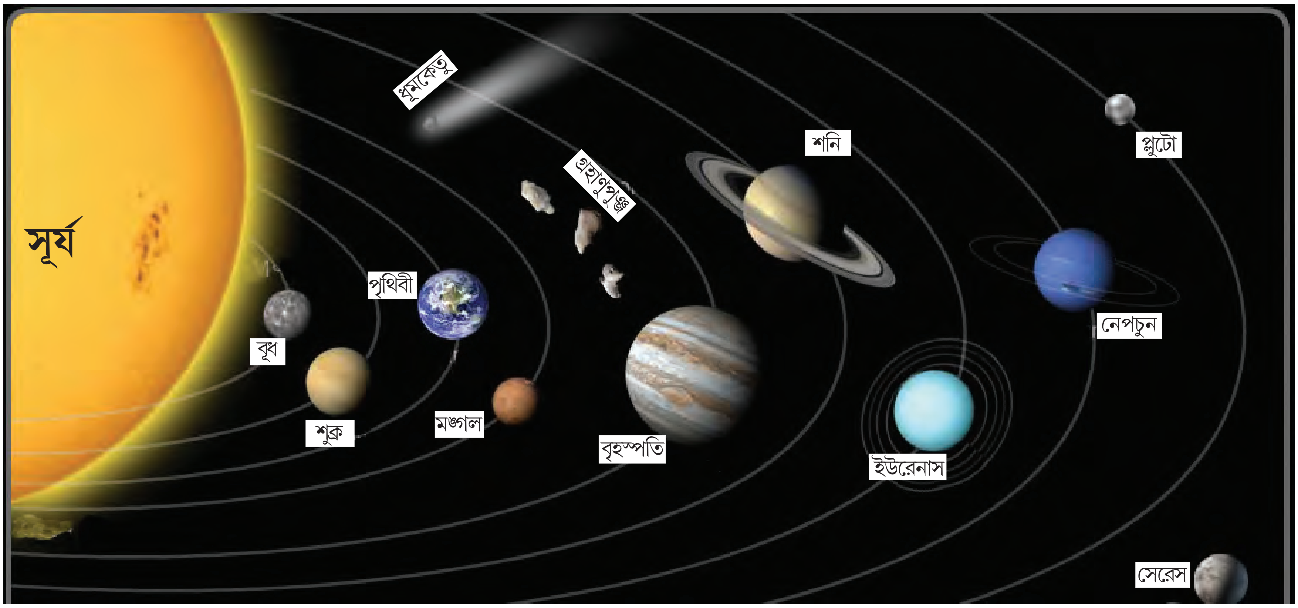

সৌরজগৎ বা সৌরপরিবার

ছবি দেখে লিখে ফেলো ...

- সৌরজগতে ক'টি গ্রহ আছে ?
- সূর্যের সবচেয়ে কাছের ও সবচেয়ে দূরের গ্রহ কী কী?
- সবচেয়ে বড়ো কোন গ্রহটাকে মনে হচ্ছে?
- দূরত্বের বিচারে আমাদের পৃথিবী কত নম্বরে আছে?
- **বন্ধুরা মিলে সৌরজগতের মডেল তৈরি করো।**

আমরা যা ঠিকভাবে আঁকতে পারি না...

সৌরজগতের ঠিক ছবি আঁকা যায় না। সূর্য পৃথিবীর থেকে ১৩ লক্ষ গুণ বড়ো। বৃহস্পতির মধ্যে ঢুকে যেতে পারে ১৩০০ পৃথিবী। তাহলে কী করে একই ছবিতে সূর্য, বৃহস্পতি আর পৃথিবীকে একসাথে দেখানো যাবে?

- সৌরজগতের যে ছবি আঁকা হয় তা শুধু সাধারণ ধারণা তৈরি করার জন্য।

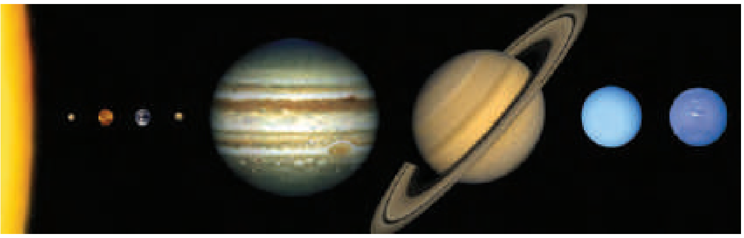

কত অজানা কথা !

সূর্যের বাইরের দিকের উষ্ণতা প্রায় ৬০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (সে.)। আর ভিতরের দিকের উষ্ণতা প্রায় ১.৫ কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (সে.)।

পৃথিবীর চেয়ে সূর্য ১৩ লক্ষ গুণ বড়ো। আর ৩ লক্ষ গুণ ভারী।

আকাশগঙ্গা ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে কিছুটা দূরে প্রান্তভাগে রয়েছে আমাদের সৌরজগৎ।

সূর্যরশ্মির ২০০ কোটি ভাগের একভাগ মাত্র পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়।

সূর্যের গায়ে যেখানে উত্তাপ একটু কম, সে জায়গাগুলো একটু কম উজ্জ্বল। তাই কালো দাগের মতো দেখায়। এগুলো হলো সৌরকলঙ্ক।

চাঁদ সূর্যের তুলনায় বহুগুণ ছোটো হলেও, সূর্যের থেকে অনেক বেশি কাছে আছে। তাই পৃথিবী থেকে চাঁদ আর সূর্য দুটোই প্রায় সমান আকারের মনে হয়।

সূর্যের মতো মাঝারি হলুদ নক্ষত্রের আয়ু সাধারণত ১০০০ কোটি বছর।

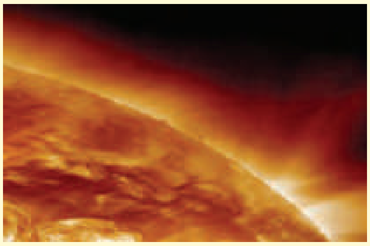

সূর্যের বাইরের অংশে (করোনা) ছোটো ছোটো বিস্ফোরণ হলে প্রচুর পরিমাণে আয়নিত কণা, গ্যাস, রশ্মি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। একে সৌরঝড় (Solar Storm) বলে। প্রতি ১১ বছর অন্তর এই ঝড় জোরালো হয়। তখন পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ, যোগাযোগ ব্যবস্থায় গোলযোগ দেখা দেয়।

খালি চোখে সূর্যের দিকে তাকাতে নেই। রেটিনা পুড়ে গিয়ে চোখের ক্ষতি হতে পারে। সূর্যগ্রহণের সময়ও খালি চোখে সূর্যের দিকে তাকাবে না।

- সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশে সবথেকে উজ্জ্বল একটা জ্যোতিষ্ক দেখা যায় — ‘সন্ধ্যাতারা’। কিন্তু ভালো করে লক্ষ করলে দেখবে ওটা তারার মতো মোটেই মিট মিট করে না। ওটা আসলে ‘শুক্রগ্রহ’। এই শুক্রগ্রহকে সন্ধেবেলা ছাড়া আর কোন সময়ে, আকাশের কোনদিকে দেখা যায় জানো? শুক্রগ্রহের মতো আরও সাতটা গ্রহ আছে সূর্যের পরিবারে।

গ্রহ

গ্রহ (Planet)

- গ্রহের নিজস্ব আলো ও উত্তাপ নেই।
- নক্ষত্রের আলোয় আলোকিত হয়।
- নক্ষত্রের আকর্ষণে নক্ষত্রের চারদিকে ঘোরে।
- গ্রহ নক্ষত্রের থেকে অনেক ছোটো হয়।

বিরাট বড়ো লাট্টু-পাড়া

সৌর পরিবারের ভিতরের দিকের (অন্তঃস্থ) গ্রহ বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল। সৌর পরিবারের বাইরের দিকের (বহিঃস্থ) গ্রহ বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন। সৌরপরিবারের প্রত্যেকটি গ্রহ নিজের অক্ষের চারদিকে এবং সেই সঙ্গে সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। শুক্র বাদে প্রত্যেকটি গ্রহই ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে অর্থাৎ পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করে।

বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন হলো অতিকায় গ্যাসীয় গ্রহ। বুধ, শুক্র, মঙ্গল আকৃতি আয়তনে অনেকটা পৃথিবীর মতো।

সৌরজগতের গ্রহদের মজার কথা

বুধ

বুধ (Mercury)

- সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ। (৫.৮ কোটি কিমি)
- ধূসর রং -এর গ্রহের গায়ে প্রচুর গর্ত।
- যে দিকটা সূর্যের দিকে থাকে তার উষ্ণতা ৪৩০° সে.।
- আবর্তন : ৫৮ দিন ১৭ ঘণ্টা।
- পরিক্রমণ : ৮৮ দিন।

শুক্র (Venus)

- পৃথিবীর সবথেকে কাছের এই গ্রহ পৃথিবীর প্রায় সমান মাপের।
- সূর্য থেকে দূরত্ব ১০.৭ কোটি কিমি।
- আবর্তন : ২৪৩ দিন।
- পরিক্রমণ : ২২৫ দিন।
- সৌরজগতের উষ্ণতম গ্রহ (৪৬৫° সে.)। প্রচুর কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকায় উষ্ণতা এত বেশি।

শুক্র

পৃথিবী

পৃথিবী (Earth)

- সূর্য থেকে দূরত্ব ১৫ কোটি কিমি।
- গড় তাপমাত্রা ১৫° সে.।
- সৌরজগতের একমাত্র গ্রহ যেখানে প্রাণের অস্তিত্ব আছে।
- আবর্তন : ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড।
- পরিক্রমণ: ৩৬৫ দিন ৫ ঘ. ৪৮ মি. ৪৬ সে.।
- নীল গ্রহ : মহাকাশ থেকে নীল রং-এর দেখায়।

মঙ্গল (Mars)

- সূর্য থেকে দূরত্ব ২২.৮ কোটি কিমি।
- মাটিতে প্রচুর ফেরাস অক্সাইড (লোহা) থাকায় দেখতে লাল। তাই লালগ্রহ।
- তাপমাত্রা অনেকটা পৃথিবীর মতো, তাই প্রাণের খোঁজ চলছে । তবে জানা গেছে যে এই গ্রহে একসময় জল ছিল।
- আবর্তন : ২৪ ঘ. ৩৭ মি.।
- পরিক্রমণ : ৬৮৭ দিন।

মঙ্গল

বৃহস্পতি

বৃহস্পতি (Jupiter)

- সবচেয়ে বড়ো গ্রহ। মাধ্যাকর্ষণ সবথেকে বেশি।
- সূর্য থেকে দূরত্ব ৭৭.৮ কোটি কিমি।
- তাপমাত্রা : −১৫০° সে.।
- আবর্তন : ৯ ঘ. ৫০ মি.।
- পরিক্রমণ : ১২ বছর

শনি (Saturn)

- সূর্য থেকে দূরত্ব ১৪২.৭ কোটি কিমি।
- তাপমাত্রা : −১৮৪° সে.।
- আবর্তন : ১০ ঘ. প্রায়।
- পরিক্রমণ : ২৯ বছর ৬ মাস।
- ঘনত্ব জলের থেকেও কম।
- ধূলিকণা, বরফ, পাথরের টুকরো দিয়ে তৈরি উজ্জ্বল ৭টা বলয় আছে।

শনি

ইউরেনাস

ইউরেনাস (Uranus)

- সূর্য থেকে দূরত্ব ২৮৭ কোটি কিমি।
- মিথেন গ্যাস বেশি থাকায় রং সবুজ।
- তাপমাত্রা : −২১৬°সে., শীতলতম গ্রহ।
- আবর্তন : প্রায় ১৭ ঘ.।
- পরিক্রমণ : প্রায় ৮৪ বছর।

নেপচুন

নেপচুন (Neptune)

- মিথেন ও হিলিয়াম গ্যাস বেশি থাকায় রং নীল।
- সূর্য থেকে দূরত্ব ৪৪৯.৭ কোটি কিমি।
- তাপমাত্রা : −২১৪° সে।
- আবর্তন : প্রায় ১৬ ঘ.।
- পরিক্রমণ : ১৬৫ বছর।

বামন গ্রহ — (Pluto)

একসময় প্লুটোকে সৌরজগতের নবম গ্রহ হিসাবে ধরা হতো। কিন্তু ২০০৬ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্লুটোকে বামন গ্রহ (Dwarf Planet) অ্যাখ্যা দিয়েছেন। নিজের কক্ষপথে কোনো মহাজাগতিক বস্তু এলে বামন গ্রহেরা তা সরিয়ে দিতে পারে না। চাঁদের থেকেও ছোটো প্লুটো, সূর্যকে পরিক্রমণ করে ২৪৮ বছরে।

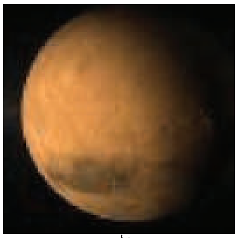
প্লুটো

উপগ্রহ

উপগ্রহ

যে জ্যোতিষ্কগুলো নিজের আলো ও উত্তাপ ছাড়াই গ্রহের আকর্ষণে গ্রহের চারিদিকে ঘোরে তাদের উপগ্রহ (Satellite) বলে।

চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার কিমি। পৃথিবীর আয়তনের চার ভাগের এক ভাগের সমান চাঁদ। বিজ্ঞানীরা মনে করেন পৃথিবীর সঙ্গে কোনো ছোট্টো জ্যোতিষ্কের ধাক্কা লেগে চাঁদের জন্ম হয়েছে। চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর ১/৬ ভাগ। অর্থাৎ একই শক্তি প্রয়োগ করে চাঁদে পৃথিবীর চেয়ে ছয় গুণ বেশি উঁচুতে লাফানো যায়। চাঁদ তার আবর্তন (নিজ অক্ষের চারিদিকে ঘোরা) আর পরিক্রমণ (সূর্যের চারদিকে ঘোরা) শেষ করে প্রায় একই সময়ে (২৭ দিন ৮ ঘণ্টায়)। তাই পৃথিবী থেকে আমরা চাঁদের একটা দিকই দেখতে পাই।

কার ভাগে কটা উপগ্রহ

গ্রহ	উপগ্রহের সংখ্যা	বিশেষ বিশেষ উপগ্রহ
পৃথিবী	১	চাঁদ
মঙ্গল	২	ডাইমোস ও ফোবোস
বৃহস্পতি	৬৭	গ্যানিমিড, ইউরোপা
শনি	৫৩	টাইটান (বৃহত্তম)
ইউরেনাস	২৭	মিরান্ডা
নেপচুন	১৩	ট্রাইটন

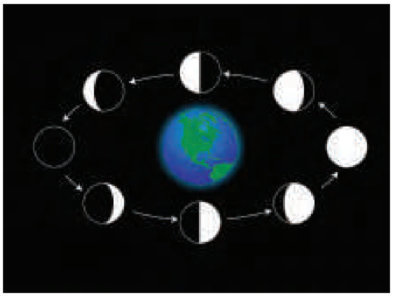

অমাবস্যা থেকে পূর্ণিমা আবার পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যায় চাঁদের আলোকিত অংশের বাড়া কমাকে বলে চন্দ্রকলা। একটা পূর্ণিমা থেকে আরেকটা পূর্ণিমা পর্যন্ত সময়কে বলে চান্দ্রমাস।

সৌরজগতের আরও সদস্য ....

গ্রহাণুপুঞ্জ

গ্রহের মতোই খুব ছোটো ছোটো জ্যোতিষ্ক (গ্রহাণু) নির্দিষ্ট কক্ষপথে সূর্যের চারিদিকে পাক খায়। এদের একসঙ্গে **গ্রহাণুপুঞ্জ (Asteroids)** বলে। মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝে প্রায় ৪০ হাজার গ্রহাণুপুঞ্জ দেখা যায়। 'সেরেস্' হলো সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহাণু।

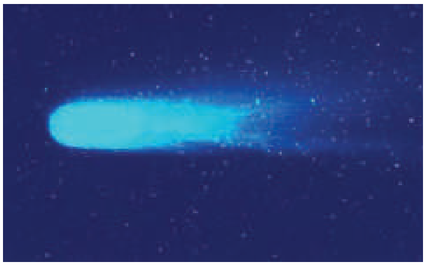

ধূমকেতু

পৃথিবী থেকে হ্যালির ধূমকেতু ৭৬ বছর বাদে বাদে দেখা যায়। ১৯৮৬ সালে একে শেষ দেখা গেছে। আবার কত সালে দেখা যাবে বলোতো?

ধূমকেতু

ঝাঁটার মতো লেজবিশিষ্ট উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ককে বলে **ধূমকেতু (Comets)**। সূর্যের কাছাকাছি এলে ধূমকেতুর ধুলো, গ্যাস জ্বলতে শুরু করে এবং লেজের মতো আকৃতি তৈরি হয়।

উল্কা

মেঘহীন রাতের আকাশে অনেক সময় হঠাৎ আলোর রেখা নেমে আসতে দেখা যায়। একে বলে — তারা খসা। আসলে এটা উল্কাপাত। ধূমকেতু, গ্রহাণুপুঞ্জের ভাঙা টুকরো মহাকাশে ছড়িয়ে থাকে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের মধ্যে এসে পড়লে প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসতে থাকে পৃথিবীর দিকে। বাতাসের সঙ্গে ঘষা লেগে জ্বলতে শুরু করে। জ্বলন্ত আগুনের ফুলকিগুলোকে তখন অন্ধকার আকাশে তারা বলে ভুল হয়। বাতাসে পুড়ে মিলিয়ে যায় উল্কা (Meteor)। তবে মাঝে মাঝে বড়ো উল্কার কিছুটা অংশ পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ে। কখনো উল্কাবৃষ্টি (Meteor shower) দেখেছো? একসঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে উল্কা, বৃষ্টির মতো ছুটে আসে পৃথিবীর দিকে।

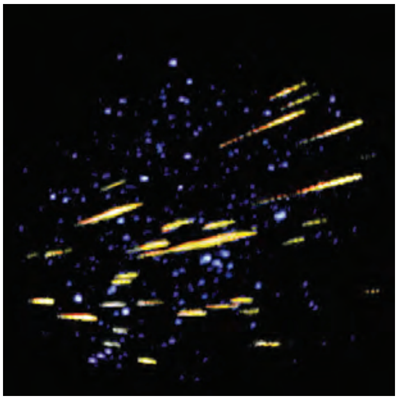

উল্কা

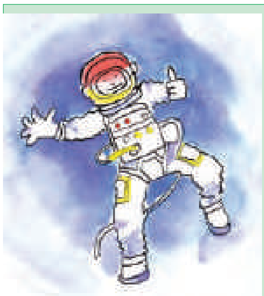

'মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে.....'

মহাশূন্যে আছে লক্ষ লক্ষ ছায়াপথ। এক একটা ছায়াপথে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র। আকাশগঙ্গা ছায়াপথের এরকম একটা নক্ষত্র হলো সূর্য। সূর্যের পরিবারের অসংখ্য গ্রহ, উপগ্রহের মাঝে আছে আমাদের পৃথিবী।

পৃথিবীতে আছে মানুষ। আর মানুষের আছে উন্নততর মস্তিষ্ক। তাই প্রতিনিয়ত মানুষ পর্যবেক্ষণ করছে, আবিষ্কার করছে, উপলব্ধি করছে মহাবিশ্বকে!

তুমি মহাবিশ্বের নাগরিক। তোমার পুরো ঠিকানা লিখে ফেলো —

নাম—

শহর/গ্রাম—

রাজ্য—

দেশ—

মহাদেশ—

গ্রহ—

ছায়াপথ—

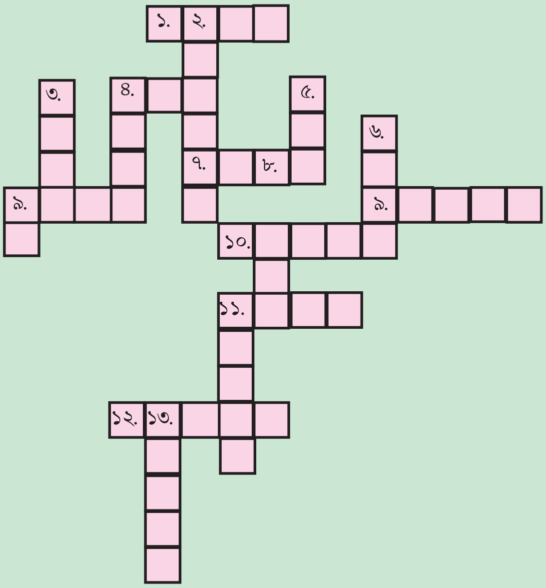

শব্দের খেলা

পাশাপাশি :

১. হ্যালির ______
৪. মহাকাশে যাওয়া প্রথম প্রাণী
৭. পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের ঘোরার সময়কাল
৮. এরা গ্রহের চারিদিকে পাক খায়
৯. বড়ো গ্রহের ভাঙা অংশ
১০. ______ প্লুটো
১১. সূর্যের ঝড়
১২. সূর্য যে ছায়াপথে আছে

ওপর-নীচ :

২. মহাকাশে যারা পাড়ি দেন
৩. মহাকাশ দেখার যন্ত্র
৪. মঙ্গলকে যা বলা হয়
৫. বৃহত্তম গ্রহাণু
৬. পৃথিবী
৮. তারা খসা
১১. সূর্যের পরিবার
১৩. এক নক্ষত্রমণ্ডল

কেন হয়? লিখে ফেলো —

- বুধের এক বছর পৃথিবীর চেয়ে কম সময়ে হয়।
- আমরা চাঁদের একটা পিঠ দেখতে পাই।
- ধূমকেতু দেখা যায় অনেকদিন বাদে বাদে।
- দিনের বেলা জ্যোতিষ্কদের দেখা যায় না।
- মঙ্গলের মাটির রং লাল।
- বেশিরভাগ সময় চাঁদ কেন 'ফালি'-র মতো দেখায়?

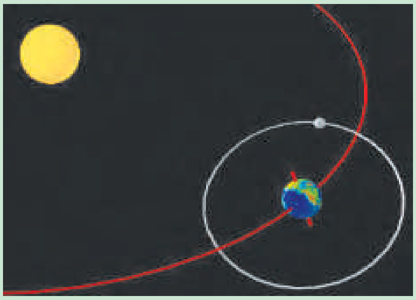

এই ছবিটি ঠিকভাবে চিহ্নিত করো।

আমাদের মধ্যে তফাৎ খোঁজো —

১ নক্ষত্র আর গ্রহ
২ গ্রহ আর উপগ্রহ
৩ ধূমকেতু আর উল্কা

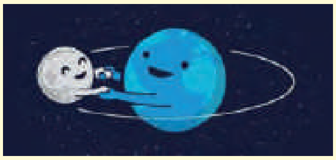

- সৌর জগতের ছবি আঁকো এবং চিহ্নিত করো।
- সম্প্রতি খবরের কাগজে মহাকাশ, উল্কাবৃষ্টি, সৌরঝড়, মঙ্গলগ্রহ-অভিযান, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করে কোলাজ তৈরি করো।

মহাকাশে যেতে হলে --

পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় ৭০০ কোটি। ভবিষ্যতে মানুষ শুধু পৃথিবীতেই নয়, হয়তো বাস করবে চাঁদে বা মঙ্গল গ্রহে। হয়তো তুমিও কোনোদিন রকেটে চড়ে পাড়ি দেবে মহাশূন্যে!

মহাকাশযাত্রা ও রকেট

একটা পাথর ওপর দিকে ছুঁড়ে দিলে পৃথিবীর টানে সেটা সবসময় নীচের দিকেই পড়ে। পৃথিবীর এই মাধ্যাকর্ষণ এড়িয়ে মহাশূন্যে যাওয়া সহজ কথা নয়। এর জন্য চাই এমন এক যান যার পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবকে ছাড়িয়ে মহাশূন্যে পৌঁছানোর ক্ষমতা ও গতি থাকবে। রকেট হলো বিজ্ঞানের সেই আবিষ্কার যা সহজে মহাকাশে পাড়ি দিতে পারে। রকেটের জ্বালানি পুড়ে তৈরি হওয়া গ্যাসের প্রবল ধাক্কায় রকেট ওপরের দিকে ওঠে। মহাকাশে যাওয়ার পোশাককে বলে 'স্পেস স্যুট'। ভেতরে হাওয়া ভরা থাকে, এমনভাবে তৈরি যাতে মহাকাশের কোনো রশ্মি এর কোনো ক্ষতি করতে না পারে।

রকেট

NASA (National Aeronotics and Space Administration)-র স্পেস শাটল 'কলম্বিয়া'

স্পেস শাটল

রকেটে চড়ে মহাকাশে যাওয়া তো যায়। কিন্তু রকেটে করে নিরাপদে পৃথিবীর বুকে ফিরে আসা যায় না। তাহলে উপায়? স্পেস শাটল বা মহাকাশ বিমান।

কৃত্রিম উপগ্রহ

মানুষের তৈরি যন্ত্র যা পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। বহু দেশ মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়েছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস, সমুদ্র পরিবহণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগাম সতর্কতা এবং মহাকাশ গবেষণায় এই কৃত্রিম উপগ্রহগুলোকে কাজে লাগানো হয়।

কৃত্রিম উপগ্রহ

কিউরিওসিটি রোভার

২০১২ সালে 'কিউরিওসিটি' রোভার মঙ্গলে অবতরণ করে। মঙ্গলের মাটি, জল, আবহাওয়া, প্রাণের অস্তিত্ব সংক্রান্ত গবেষণা ছিল এর মুখ্য উদ্দেশ্য।

মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্ব ও অন্যান্য অভিযান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করো।

মহাকাশ গবেষণায় ভারত

- **ISRO** (Indian Space Research Organisation) — ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র।
- ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ **আর্যভট্ট**। এছাড়াও ভাস্কর ১, ভাস্কর ২, INSAT ইত্যাদি।
- ভারতের প্রথম মহাকাশচারী **রাকেশ শর্মা** (১৯৮৪)।
- **চন্দ্রায়ন ১**— ভারতের প্রথম চন্দ্রযানের চাঁদে অবতরণ (২০০৮)।

চন্দ্রগ্রহণ

কোনো কোনো পূর্ণিমায় পৃথিবীর ছায়ায় চাঁদ ঢেকে গিয়ে চন্দ্রগ্রহণ হয়। চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ চলাকালীন জল, রান্না করা খাবারে বিষক্রিয়া হয়, বাড়ির বাইরে যেতে নেই — এমন কতকগুলো ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। এগুলোর কোনো বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি নেই। চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ অতি সাধারণ মহাজাগতিক ঘটনা।

চাঁদ থেকে পৃথিবী

(নিল আর্মস্ট্রং, এডুইন অলড্রিন এবং মাইকেল কলিন্স)

চাঁদে অভিযান

১৯৬৯-এর ১৬ জুলাই আমেরিকার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে উড়ে গেল অ্যাপোলো - ১১। এর মূল অংশ 'কলম্বিয়া' তে মহাকাশচারীরা ছিলেন আর 'ঈগল' নামে আরেক অংশের সাহায্যে নিল আমস্ট্রং ও এডুইন অলড্রিন চাঁদের মাটি ছুঁলেন ২০ জুলাই।

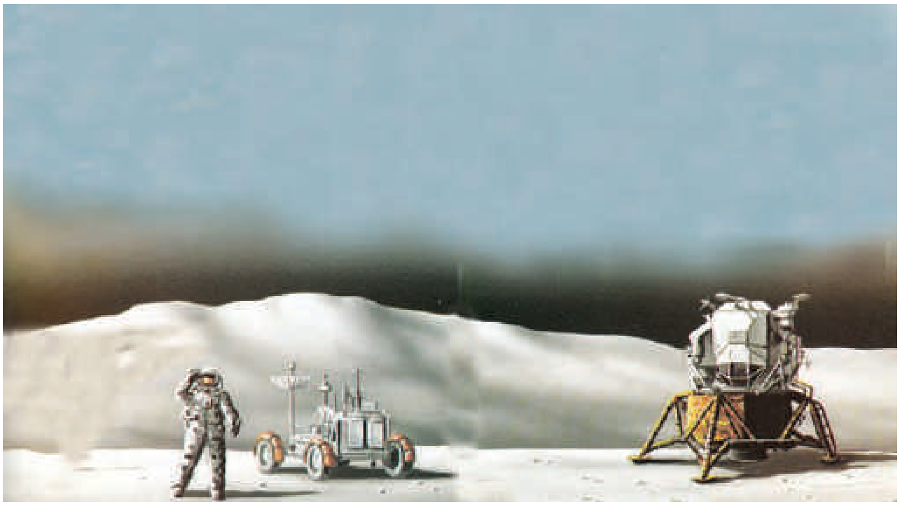

মহাকাশচারী

- মহাকাশের প্রথম যাত্রী রাশিয়ার কুকুর - লাইকা। সালটা ১৯৫৭।
- পৃথিবীর প্রথম মহাকাশচারী ইউরি গ্যাগারিন। প্রথম মহিলা মহাকাশচারী ভ্যালেন্তিনা তেরেশকোভা।
- কল্পনা চাওলা---প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি মহাশূন্যে পাড়ি দেন, ১৯৯৭ সালে ১ ফেব্রুয়ারি।

- সুনীতা উইলিয়ামস জন্মসূত্রে দ্বিতীয় ভারতীয় মহিলা মহাকাশচারী, যিনি সব থেকে বেশি সময় মহাকাশে কাটিয়েছেন।

আমরাও চাঁদে পাড়ি দেওয়ার কল্পনা করতে পারি —

এখন আমরা চাঁদে। এখানে বাতাস নেই। নিশ্বাস নেওয়া যায় না। তাই আমাদের স্পেসস্যুটে বাতাস ভরা আছে। এখানে নিজেদের এত হালকা লাগে যে অনায়াসে বড়ো বড়ো খানাখন্দ লাফিয়ে পার হওয়া যায় অথবা এক লাফে উঠে যাওয়া যায় উঁচু টিলায়। চাঁদ পৃথিবীর তুলনায় হালকা। তাই তার আকর্ষণ শক্তিও কম। এখানে সমস্ত জিনিস পৃথিবীর তুলনায় ছয়ভাগ হালকা হয়ে যায়। এখানে সবসময় নিস্তব্ধ। যত চিৎকারই করো না কেন কেউ শুনতে পাবে না। কারণ বায়ুশূন্য স্থানে শব্দ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে পারে না। তাই এখানে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে হয় ইশারায় অথবা রেডিয়োর মাধ্যমে।

এবার আশপাশটা ভালো করে দেখে নেওয়া যাক —

কোথাও গাছপালা নেই, এবড়ো-খেবড়ো জমি, ছোটো বড়ো পাথর, গোল গোল বিশালাকার গর্ত, ধূসর ধুলোয় ভরতি চারদিক। সূর্যের আলো পৌঁছতে পারে না, তাই পৃথিবী থেকে এগুলোকে চাঁদের গায়ে কালো কালো দাগের মতো দেখায়। আর আকাশটা আদৌ নীল নয়, ঘন কালো। বাতাস না থাকায় সূর্যের আলোর বিচ্ছুরণ হয় না। ফলে কোনো রং নেই। সবকিছুই আলো পড়লে সাদা আর না পড়লে কালো দেখায়। দিনের বেলাতেও আকাশে তারা ঝলমল করছে। একদিকে কালো আকাশে ঝুলছে পৃথিবী—প্রকাণ্ড সাদা আর নীল গোলকের মতো। এখানে একদিন যেতে পুরো দু-সপ্তাহ কেটে যায়। সূর্যের তাপে পাথর ভীষণ গরম হয়ে ওঠে (প্রায় ১১৭°সে.) আবার রাতও চলে দু-সপ্তাহ ধরে। তখন ভীষণ ঠান্ডা, তাপমাত্রা প্রায় হিমাঙ্কের ১৫০°সে. নীচে নেমে যায়।

মিলিয়ে দাও

ধূমকেতু	নক্ষত্রমণ্ডল
তারা	জ্যোতিষ্কের নিজেদের পথ
ছায়াপথ	তারাখসা
শুক্র	ল্যাজওলা জ্যোতিষ্ক
উল্কা	জ্বলন্ত গ্যাসীয় পিণ্ড
কক্ষপথ	লক্ষ লক্ষ তারার সমষ্টি
কালপুরুষ	সন্ধ্যাতারা
লালগ্রহ	আকাশ নিয়ে যারা গবেষণা করেন
জ্যোতির্বিজ্ঞানী	মঙ্গল

মগজাস্ত্র

শনি ছাড়া সৌরজগতের আরো তিনটে গ্রহের বলয় আছে। বলতে পারো কোন কোন গ্রহ? কোন গ্রহের একদিন এক বছরের থেকে বড়ো? (সূত্র : যে গ্রহের পরিক্রমণের থেকে আবর্তনের সময় বেশি)।

- গ্রহদের বৈশিষ্ট্য লিখে কার্ড তৈরি করো। এলোমেলো করে দাও। দলে ভাগ হয়ে যাও। এক একটি দল এক একটি করে কার্ড তোলো আর দেখোতো চিনতে পার কিনা?
- একটা পূর্ণিমা থেকে পরের পূর্ণিমা পর্যন্ত পরিষ্কার রাতের আকাশে চন্দ্রকলা খেয়াল করো। পরিবর্তন লক্ষ করো আর খাতায় ছবি এঁকে লিখে রাখো।

২ পৃথিবী কী গোল

বসন্তকালে মাঠে খেলতে দারুণ লাগে। ঝিরঝিরে বাতাস, পরিষ্কার নীল আকাশ ... চারদিকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। যদি কোনো উঁচু জায়গা থেকে দেখো তাহলে আরো অনেক দূর পর্যন্ত চোখে পড়বে। মনে হবে পৃথিবীটা যেন বিশাল গোল রুটি আর তার ওপর আকাশটা গম্বুজের মতো ঢেকে আছে। এক ছুটেই চলে যাওয়া যায় দিগন্তে, যেখানে আকাশটা এসে পৃথিবীতে মিশেছে!

প্রাচীনকালে মানুষ বিশ্বাস করত যে, পৃথিবীটা চ্যাপ্টা রুটির মতো। সে সময় রেলগাড়ি, এরোপ্লেন কিছুই ছিল না। তবুও পৃথিবীর শেষ কোথায় দেখার জন্য উটের পিঠে চেপে, বড়ো বড়ো নৌকায় করে তারা অভিযানে যেতে শুরু করল।

সমুদ্রেও একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখা যায়। কোনো জাহাজ যখন সমুদ্রের দিকে যাত্রা শুরু করে, তখন তীর থেকে লক্ষ করলে, প্রথমে গোটা জাহাজটা, তারপর শুধু জাহাজের পাল, তারপর মাস্তুলের মাথাটুকু দেখা যায়। মনে হয় যেন জাহাজটা বাঁকানো ঢাল বেয়ে নীচে নেমে গেল।

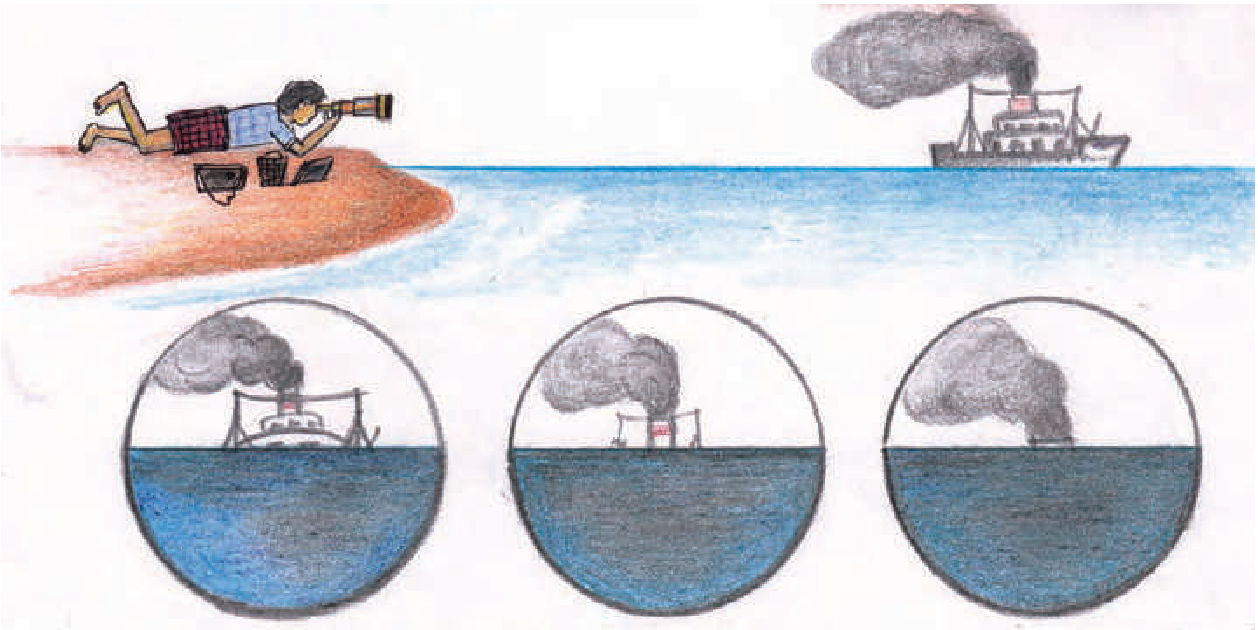

কোনো সমুদ্র বা হ্রদের ধারে দাঁড়ালে নিজেও এই ব্যাপারটা যাচাই করে দেখতে পারো।

খ্রিস্ট জন্মের দুশো বছর আগে গ্রিক দার্শনিক এরাটোস্‌থেনিস এই ব্যাপারটা লক্ষ করে বলেছিলেন যে পৃথিবী আসলে গোলাকার।

এরপর শত শত বছর কেটে গেল। মানুষ তখন বড়ো বড়ো জাহাজ বানাতে শিখল। সেইসব জাহাজে চেপে নাবিকেরা সমুদ্রপথে পৃথিবী পরিক্রমার জন্য অভিযান শুরু করল। ১৫১৯ সালে পোর্তুগিজ ভূপর্যটক ম্যাগেলান ৫টি জাহাজ নিয়ে যাত্রা শুরু করে ক্রমাগত পশ্চিমদিকে গিয়ে শেষ পর্যন্ত আবার একই বন্দরে ফিরে এলেন। এইভাবে ভূ-প্রদক্ষিণ করতে গিয়েই স্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে পৃথিবী চ্যাপটা সমতল নয় বরং গোলাকার।

আমরা কেন বুঝতে পারি না — পৃথিবী গোল?

- আসলে পৃথিবী এতই বিশাল যে একনজরে যেটুকু দেখা যায় তাতে তাকে চ্যাপটা সমতল বলে ভুল হয়। চারটে বৃত্তচাপকে লক্ষ করো। '১' এর ব্যাসার্ধ সবথেকে ছোটো। আর '৪' এর ব্যাসার্ধ সবথেকে বড়ো। সবকটা বৃত্তচাপের চিহ্নিত করা অংশটা দেখো। বলোতো, কোন বৃত্তচাপের চিহ্নিত অংশটা বেশি বাঁকা? কোন বৃত্তচাপের চিহ্নিত অংশটা প্রায় সোজা?

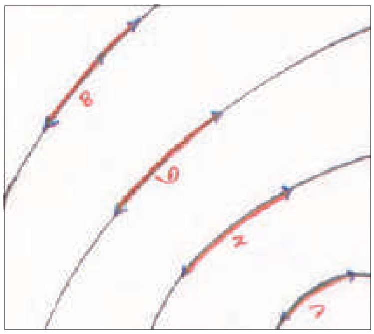

বৃত্তচাপ যত বেশি দৈর্ঘ্যের ব্যাসার্ধ নিয়ে আঁকা হয়, তার বাঁকা ভাব বা বক্রতা তত কম হয়। পৃথিবীর গড় ব্যাসার্ধ ৬৪০০ কিমি। এত বড়ো ব্যাসার্ধের একটা বৃত্তের ওপর দাঁড়িয়ে, এর খুব সামান্য অংশই আমাদের চোখে পড়ে। তাই ভূ-পৃষ্ঠটা চ্যাপটা সমতল বলেই মনে হয়।

সহজ কাজ

একটা পেনসিলে সুতো বেঁধে নাও। সুতো দিয়ে মেপে ৫ সেমি,১৫ সেমি ও ৩০ সেমি-র তিনটে বৃত্তচাপ এঁকে দেখো। নিজেই বুঝতে পারবে — পৃথিবী গোলাকার হওয়া সত্ত্বেও, আমরা কেন বুঝতে পারি না।

আর কী থেকে বোঝা যায়?

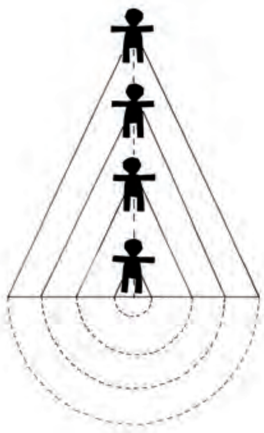

● কোনো ফাঁকা মাঠ বা অনেকখানি খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখলে দিগন্তরেখাকে গোলাকার বলে মনে হয়। জাহাজের ডেক থেকেও সমুদ্রকে দেখলে গোলাকার লাগে। যত উঁচু জায়গা থেকে দেখবে, ততই আরও বেশি অংশ চোখে পড়বে। কিন্তু দিগন্তকে সবসময় গোলাকারই মনে হবে।

● চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদের ওপর পৃথিবীর গোলাকার ছায়া পড়ে। কোনো গোলাকার বস্তুর ছায়াই একমাত্র গোলাকার হয়।

চন্দ্রগ্রহণ

● পৃথিবীর এক এক জায়গায় আলাদা সময়ে সূর্য ওঠে। কোথাও আগে আবার কোথাও পরে। পৃথিবী চ্যাপটা সমতল হলে সবজায়গাতেই একই সময় সূর্যোদয় হতো।

বর্তমানে এইসব পর্যবেক্ষণ আর যুক্তির মাধ্যমে পরোক্ষ প্রমাণের আর দরকার পড়ে না। মহাকাশচারীরা মহাশূন্য থেকে উজ্জ্বল নীল গোলকের মতো পৃথিবীকে দেখেছেন। এরোপ্লেন, কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে পৃথিবীর ছবি তোলা সম্ভব হয়েছে।

পৃথিবী গোল — এই ধারণা প্রথম কাদের?

গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদের ওপর পৃথিবীর গোলাকার ছায়া দেখে বলেন— পৃথিবী গোলাকার। ভারতীয় বিজ্ঞানী আর্যভট্ট এবং গ্রিক ভূগোলবিদ এরাটোসথেনিস— গোলাকার পৃথিবীর ধারণাকেই সমর্থন করেন।

কিন্তু পৃথিবী কী সত্যিই পুরোপুরি গোল?

কিছুটা ময়দা মাখা নিয়ে একটা মাঝারি মাপের গোলা তৈরি করো। গোলাটার মধ্যে লম্বালম্বি একটা কাঠি ঢুকিয়ে কাঠিটাকে বেশ জোরে জোরে ঘুরিয়ে দেখো কী হয়?

কিছুক্ষণ বেশ জোরে জোরে ঘোরাবার পর লক্ষ করো গোলাটা কি আগের মতো পুরোপুরি গোল আছে, নাকি ওপর-নীচ কিছুটা চ্যাপটা হয়ে মাঝখানটা কিছুটা স্ফীত হয়েছে?

জিয়ড

➢ পৃথিবী নিজের অক্ষের চারিদিকে অনেক দ্রুত ঘোরে বলে ওপর-নীচ কিছুটা চাপা, আর মাঝ বরাবর কিছুটা স্ফীত। তাই পৃথিবী পুরোপুরি গোল নয়। কমলালেবু বা ন্যাসপাতির সঙ্গে পৃথিবীর আকৃতির কিছুটা মিল থাকলেও আসলে '**পৃথিবীর প্রকৃত আকৃতি পৃথিবীরই মতো**'। যাকে ইংরাজিতে বলা হয় '**জিয়ড**' (**Geoid = Earth-shaped**)।

➢ পৃথিবীর পরিধি প্রায় ৪০,০০০ কিমি। পৃথিবীর মেরুব্যাস ১২৭১৪ কিমি আর নিরক্ষীয় ব্যাস ১২৭৫৬ কিমি। পৃথিবীর নিরক্ষীয় ব্যাস মেরুব্যাসের তুলনায় (১২৭৫৬-১২৭১৪ কিমি) ৪২ কিমি বেশি। অর্থাৎ পৃথিবী মাঝবরাবর ৪২ কিমি স্ফীত।

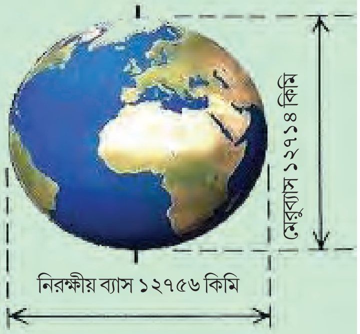

ভেবে দেখেছ?

পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্থান হিমালয় পর্বতের '**মাউন্ট এভারেস্ট**' সমুদ্র সমতল থেকে ৮,৮৪৮ মি উঁচু। আবার সর্বনিম্ন স্থান প্রশান্ত মহাসাগরের '**মারিয়ানা খাত**' সমুদ্র সমতল থেকে ১০, ৯১৫ মি নীচু। সবথেকে উঁচু আর সবথেকে নীচু জায়গাদুটোর মধ্যে পার্থক্য প্রায় ২০০০০ মিটার বা ২০কিমি। **পৃথিবীর ওপরের এই উঁচু নীচু জায়গাগুলোর জন্য কি তার আকৃতির কোনো পরিবর্তন হয়?** পৃথিবীর ওপরে যত পাহাড়, মালভূমি, নদী, হ্রদ, সমুদ্র আছে, তার জন্য কি পৃথিবীর আকৃতিটা এবড়ো-খেবড়ো গোলকের মতো?—**আসলে পৃথিবী একটা বিশাল গোলক। তার গায়ে পাহাড়-পর্বত, নদী-সাগর থাকা সত্ত্বেও একে মহাকাশ থেকে মসৃণ গোলকের মতোই দেখায়।**

মগজাস্ত্র

- গোলাকার পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে আমরা পড়ে যাই না কেন?
- কোনো জিনিসের ওজন পৃথিবীর মাঝ বরাবর অর্থাৎ নিরক্ষরেখায় যত হয়, দুইপ্রান্তে মেরুর কাছে তার থেকে বেশি হয়। ভেবে দেখো এরকম কেন হয়? পৃথিবীর আকৃতির সঙ্গে কী এর কোনো সম্পর্ক আছে?

তুমি কোথায় আছ

বিনয় স্কুল থেকে ফিরে মাঠে চলে এল। পাড়ার গোপালদা ফুটবল খেলা শেখাবে। আরও অনেকে এসেছে। গোপালদার বাঁশি বাজতেই যে যার জায়গা মতো দাঁড়িয়ে পড়ল। উত্তর দিকের গোল-পোস্ট থেকে প্রায় কুড়ি পা আর মাঠের ধারের ক্লাবঘর থেকে প্রায় পঁচিশ পা হবে এরকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল বিনয়।

বিকেলে যখন খেলতে যাও তুমিও মাঠের কোন জায়গায় আছ খুব সহজেই বলে দিতে পারো । গাছ, খুঁটি, ল্যাম্পপোস্ট বা রাস্তা এরকম যেকোনো কিছু থেকে তুমি কতটা দূরে — এভাবেই তোমার অবস্থান বলবে তাইতো? কিন্তু যদি মাঠের ধারে বা আশেপাশে কোনো কিছুই না থাকতো—তাহলে তুমি কীভাবে বলতে, তুমি কোথায় আছ?

ভেবে দেখো—

পৃথিবীর ওপর তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছ— এ প্রশ্নের উত্তর তুমি কীভাবে দেবে?

তোমার নিজের ফুটবলটা হাতে নিয়ে দেখো। বলের গায়ে একটা আঙুল রেখে বলোতো, তুমি বলের কোথায় আঙুলটা রেখেছ?

সমতল পৃষ্ঠে, কোনো জায়গার অবস্থান বা দিক বলা সহজ। কিন্তু যার কোনো ধার নেই, কোণা নেই, ওপর-নীচ বলে কিছু নেই, সেখানে দাঁড়িয়ে তোমার অবস্থান বলতে পারা সহজ নয়। কোনো জায়গার অবস্থান বোঝাতে পৃথিবীর ওপর কতকগুলো নির্দিষ্ট বিন্দু ও রেখা কল্পনা করা হয়েছে।

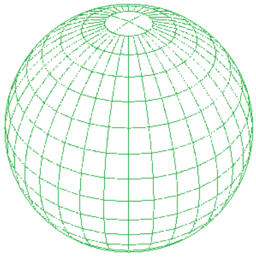

এসো আমরা চিনে নিই পৃথিবীর কাল্পনিক রেখা ও বিন্দুগুলোকে!

পৃথিবীর একটা ছোটো মডেল হলো গ্লোব।

গ্লোব-এর ওপর আঁকা কাল্পনিক রেখাগুলোকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করো—

প্লাস্টিকের বলের গায়ে দাগ টেনে দেখেছ ?

বলের ওপরে দাগ টানলে সেটা কখনই সরলরেখা হয় না।

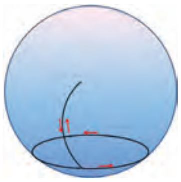

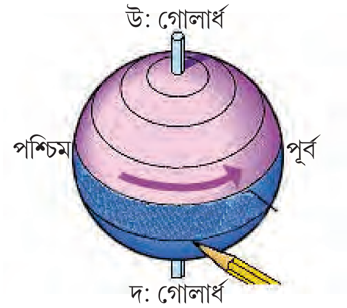

একটা রড বা দণ্ড গ্লোবের ঠিক মাঝখান দিয়ে গিয়ে উপর-নীচে ফুঁড়ে বেরিয়েছে

পৃথিবীর মাঝখান দিয়েও এরকম একটি রেখা কল্পনা করা হয়েছে। পৃথিবীর কেন্দ্র দিয়ে চলে যাওয়া এই রেখা হলো পৃথিবীর অক্ষ (Earth's axis)। পৃথিবীর অক্ষের উত্তর প্রান্ত হলো উত্তর মেরু (North Pole) ও দক্ষিণ প্রান্ত হলো দক্ষিণ মেরু (South Pole)। দুই মেরু থেকে সমান দূরে গ্লোবের ঠিক মাঝবরাবর একটি বৃত্ত রেখা আঁকা আছে। ওই বৃত্তরেখা বরাবর গ্লোবটি দুটো সমান ভাগে বিভক্ত।

জানো কী?

ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপীয়রা প্রথম কতকগুলো বিন্দু ও দাগ কল্পনা করে 'পৃথিবীর মানচিত্র' তৈরি করেন।

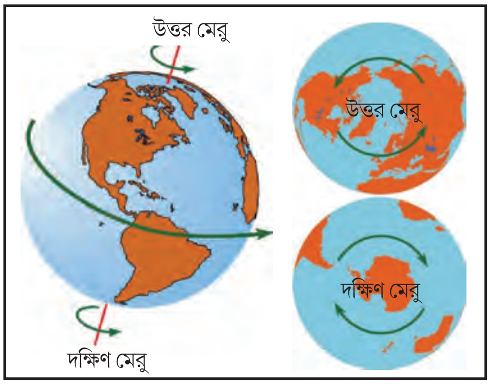

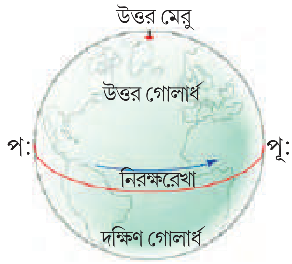

দুই মেরু থেকে সমান দূরে পৃথিবীর মাঝবরাবর পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত ওই কাল্পনিক রেখাটিকে বলে নিরক্ষরেখা বা বিষুবরেখা (Equator)। এর উত্তরের অংশ হলো উত্তর গোলার্ধ (Northern Hemisphere)। দক্ষিণ অংশ হলো দক্ষিণ গোলার্ধ (Southern Hemisphere)।

গ্লোব লক্ষ করলে দেখা যাবে নিরক্ষরেখা বা বিষুবরেখার সমান্তরালে পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমে বেশ কিছু বৃত্ত রেখা আঁকা আছে। নিরক্ষরেখার সমান্তরালে পূর্ব-পশ্চিমে অঙ্কিত কাল্পনিক রেখাগুলো হলো অক্ষরেখা (Parallels of Latitude)। নিরক্ষরেখা দৈর্ঘ্যে সবচেয়ে বড়ো। নিরক্ষরেখার মান ০°। বাকি অক্ষরেখাগুলো ক্রমশ মেরুর দিকে দৈর্ঘ্যে ছোটো হতে থাকে। সব অক্ষরেখাই পূর্ণবৃত্ত। পৃথিবীর উত্তর মেরুর মান ৯০° উ: ও দক্ষিণ মেরুর মান ৯০° দ:।

- পৃথিবীতে মোট কটা অক্ষরেখা আছে?

অবাক কাণ্ড!

পৃথিবীর কোথায় দাঁড়ালে তোমার সব দিকই দক্ষিণ দিক হবে বলোতো?

নিরক্ষরেখা ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য বিশেষ বিশেষ অক্ষরেখা —

নিরক্ষরেখার উত্তরে কর্কটক্রান্তি রেখা (২৩ ১/২°উ:) (Tropic of Cancer), সুমেরুবৃত্ত রেখা (৬৬ ১/২° উ:) (Arctic Circle)।

নিরক্ষরেখার দক্ষিণে মকরক্রান্তি রেখা (২৩১/২°দ:) (Tropic of Capricorn), কুমেরুবৃত্ত রেখা (৬৬১/২°দ:) (Antarctic Circle)

নিজেই বুঝে নাও ...

পাশের ছবিতে দেখো। একটা পাতিলেবুকে মাঝ বরাবর কেটে ফেলা হয়েছে। তাতে দুটো তল দেখা যাচ্ছে। পৃথিবীকে নিরক্ষরেখা বরাবর যদি কেটে ফেলা যেত তাহলে এরকমই দুটো তল পাওয়া যাবে।

নিরক্ষরেখা যে তল বরাবর রয়েছে তা হলো নিরক্ষীয় তল (Equatorial Plane)। এই তলের সঙ্গে পৃথিবীর অক্ষ ৯০° কোণ করে আছে।

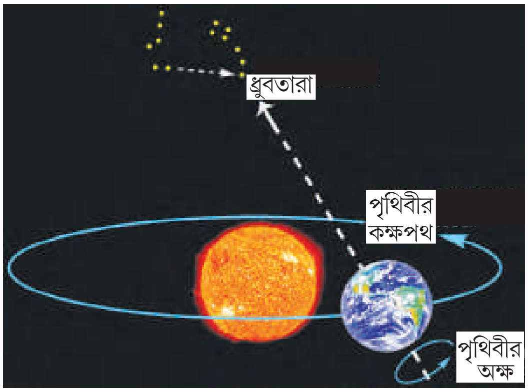

পৃথিবীর অক্ষ একদিকে হেলে আছে। অক্ষের উত্তর প্রান্ত সারাবছর ধ্রুবতারার দিকে মুখ করে থাকে। পৃথিবী যে পথে সূর্যের চারিদিকে ঘোরে তা হলো পৃথিবীর কক্ষপথ (Orbit)। কক্ষপথ যে তলে রয়েছে তা হলো কক্ষতল (Orbital Plane)। পৃথিবীর অক্ষ কক্ষতলের সঙ্গে ৬৬½° কোণ করে থাকে।

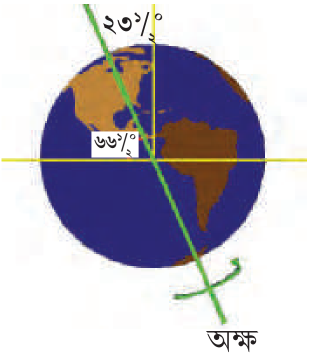

গ্লোব দেখে লিখে ফেলো.....

- নিরক্ষরেখা কোন কোন মহাদেশের কোন কোন দেশের ওপর দিয়ে গেছে?
- উত্তর গোলার্ধ ও দক্ষিণ গোলার্ধের কমপক্ষে পাঁচটি করে দেশের নাম খুঁজে বার করে লিখে ফেলো।
- তোমার দেশটা কোন গোলার্ধে আছে?

কোন দেশটি কোন গুরুত্বপূর্ণ অক্ষরেখায় আছে দেখোতো!

দেশের নাম	নিরক্ষরেখা	কর্কটক্রান্তিরেখা	সুমেরুবৃত্ত রেখা	মকরক্রান্তি রেখা	কুমেরুবৃত্ত রেখা
ব্রাজিল					
মেক্সিকো					
কেনিয়া					
সৌদি আরব					
সুমাত্রা					
চিলি					
অস্ট্রেলিয়া					
কানাডা			✓		
কলম্বিয়া					
রাশিয়া					

কোন গুরুত্বপূর্ণ অক্ষরেখায় একটাও দেশের নাম পেলে না ? কেন পাওয়া গেল না, অনুসন্ধান করো।

কোনো জায়গা পৃথিবীর কতটা উত্তরে বা কতটা দক্ষিণে তা অক্ষরেখা থেকে বোঝা যায়। কিন্তু পৃথিবীতে কোনো জায়গা কতটা পূর্বে বা কতটা পশ্চিমে, কীভাবে বোঝা যাবে? ব্যাপারটা খুব ভালো বোঝা গেল না, তাই তো? আর একটু সহজ করে বুঝে নাও।

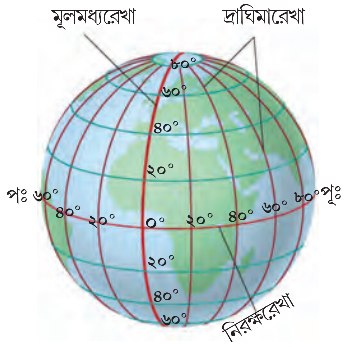

ধরো, তোমার শহরটা উত্তর গোলার্ধের কোনো এক অক্ষরেখায় রয়েছে। কিন্তু শহরটা ওই অক্ষরেখার কোথায়? অক্ষরেখাটা তো একটা পূর্ণ বৃত্ত। একটা গোটা বৃত্তরেখা তো আর স্থানটার অবস্থান হতে পারে না। তাহলে কীভাবে জানা যাবে যে শহরটা ওই গোটা বৃত্তরেখাটার ঠিক কোথায়? এই সমস্যার সমাধানের জন্য উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত কিছু রেখা টানার কথা ভাবা হয়, যেগুলো অক্ষরেখাগুলোকে ৯০° কোণে ছেদ করে কল্পনা করা হয়। উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত অঙ্কিত অর্ধেক বৃত্তরেখাগুলো হলো দ্রাঘিমারেখা (Meridian of Longitude)।

নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ যে নিরক্ষরেখা অক্ষরেখাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো। এখান থেকেই অন্য অক্ষরেখাগুলোর হিসেব শুরু হয়।

তাহলে দ্রাঘিমারেখার ক্ষেত্রে কী হবে? কোথা থেকে শুরু হবে দ্রাঘিমারেখা গোনা?

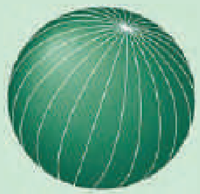

দ্রাঘিমারেখাগুলো প্রত্যেকটা একই দৈর্ঘ্যের আর প্রত্যেকটাই অর্ধেক বৃত্ত। তাই ঠিক করা হলো একটা নির্দিষ্ট দ্রাঘিমারেখা থাকবে যেখান থেকে অন্য দ্রাঘিমারেখার মান গোনা শুরু হবে। ১৮৮৪ সালে আন্তর্জাতিক আলোচনাসভায় স্থির হলো— লন্ডনের গ্রিনিচ মানমন্দিরের (রয়্যাল অবজারভেটরি) ওপর দিয়ে যে দ্রাঘিমারেখা চলে গেছে, সেটাই মূল দ্রাঘিমারেখা বা মূলমধ্যরেখা (Prime Meridian) যার মান ০°।

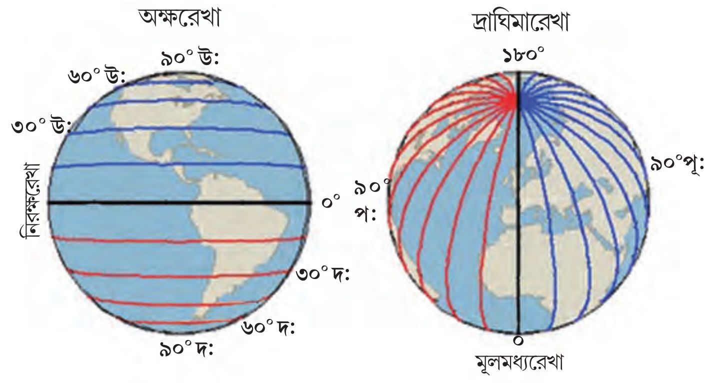

০° দ্রাঘিমারেখার (যার অন্য নাম মূলমধ্য রেখা) পূর্বে ১৮০ টা ও পশ্চিমে ১৮০ টা দ্রাঘিমারেখা আঁকা হলো। দেখা গেল ১৮০° পূ: ও ১৮০° প: দ্রাঘিমারেখা দুটো একটাই রেখা যা আবার ০° দ্রাঘিমারেখার বা মূলমধ্যরেখার ঠিক বিপরীতে রয়েছে।

০° দ্রাঘিমারেখা ও তার বিপরীতে থাকা ১৮০° দ্রাঘিমার মিলিত বৃত্ত পৃথিবীকে সমান দুটো অংশে ভাগ করে। পূর্ব অংশের নাম পূর্ব গোলার্ধ (Eastern Hemisphere) আর পশ্চিম অংশের নাম পশ্চিম গোলার্ধ (Western Hemisphere)।

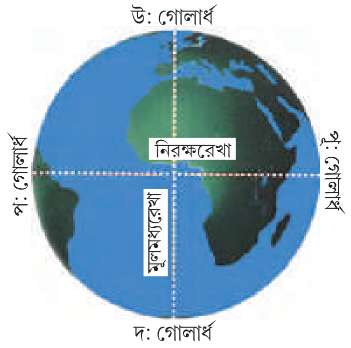

একটা লেবুকে কি শুধু মাঝখান দিয়ে কেটে দুটো সমান ভাগ করা যায়? আর কীভাবে কাটলে সমান ভাগ করা যায় ভেবে দেখো—

যে পূর্ণ বৃত্তরেখা পৃথিবীকে সমান দুটো অংশে ভাগ করে তা হলো মহাবৃত্ত (Great Circle)। এই হিসেবে নিরক্ষরেখা ও দুটি দ্রাঘিমারেখার মিলিত বৃত্তরেখা মহাবৃত্ত। তবে এছাড়া আরও অসংখ্য মহাবৃত্ত পৃথিবীর ওপর দিয়ে টানা যায়। তুমিও চেষ্টা করে দেখো আর অন্য কোনো বৃত্তরেখা দিয়ে পৃথিবীকে সমান ভাগে ভাগ করে ফেলা যায় কি না।

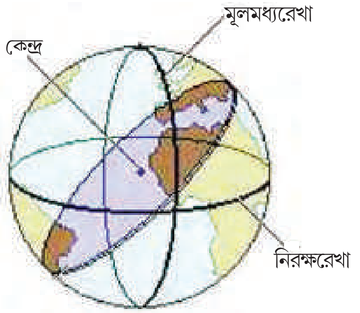

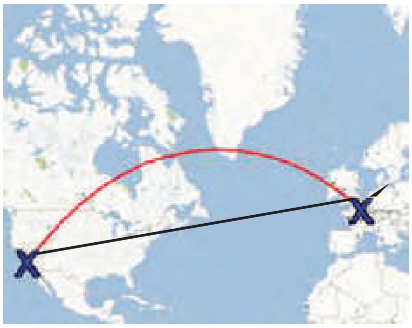

অবাক কাণ্ড

কোনো গোলকের পৃষ্ঠে মহাবৃত্ত হলো সেই বৃত্ত, যার কেন্দ্র ও গোলকটির কেন্দ্র এক।

x থেকে x´ যেতে গেলে সবথেকে ছোটো পথ কোনটা? সরলরেখাটা না বক্ররেখাটা?

কোনো গোলকের গায়ে যেকোনো দুটো বিন্দুর মধ্যে সবচেয়ে কম দূরত্ব হলো মহাবৃত্তের যে বৃত্তচাপ ওই দুই বিন্দুকে স্পর্শ করে।

সমুদ্রে বা আকাশে চলাচলের সময় নাবিকরা বা বিমান চালকরা তাই মহাবৃত্তের পথ ধরেই চলাচল করেন।

অক্ষরেখা এবং দ্রাঘিমারেখার পার্থক্য করে ফেলো—

বৈশিষ্ট্য	অক্ষরেখা	দ্রাঘিমারেখা
আকার	পূর্ণবৃত্ত	
সংখ্যা		৩৬০ টা
দৈর্ঘ্য		সব একই দৈর্ঘ্যের
কোন দিক থেকে কোনদিকে বিস্তৃত		
পারস্পরিক সম্পর্ক	পরস্পরের সমান্তরাল	

গ্লোব দেখে বুঝে নিয়ে লিখে ফেলো

দ্রাঘিমারেখা	কোন দেশ, মহাসাগর, সাগরের ওপর দিয়ে বিস্তৃত
১০° পূর্ব	
১৮° পশ্চিম	
৯০° পশ্চিম	
৪০° পূর্ব	
৬০° পূর্ব	

শব্দের খেলা

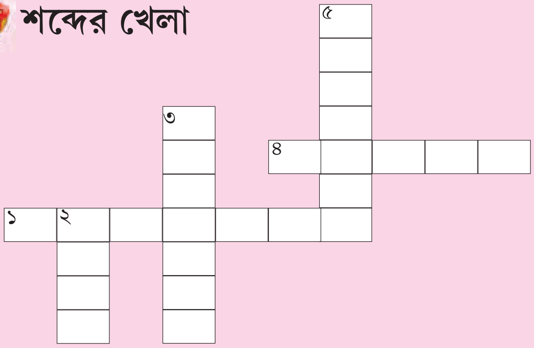

পাশাপাশি

১. ২৩$\frac{১}{২}$° দ: অক্ষরেখা

৪. ৯০° উ:

ওপর-নীচ

২. পৃথিবীর কক্ষ যে তলে আছে

৩. ২৩$\frac{১}{২}$° উ: অক্ষরেখা

৫. ৬৬$\frac{১}{২}$° উ: অক্ষরেখা

পৃথিবীর আবর্তন

তুমি যখন এই বইটা পড়ছ, ভাবছ তুমি এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে আছ। কিন্তু জানো কি, তোমার পায়ের নীচে পৃথিবীটা লাট্টুর মতো প্রচণ্ড জোরে ঘুরপাক খাচ্ছে নিজের অক্ষের চারিদিকে! আর পৃথিবীর সাথে তুমিও ঘুরেই চলেছ মহাশূন্যে। আশেপাশের ঘর, বাড়ি, রাস্তা, মাঠ, ধানক্ষেত সবই ঘুরছে তোমার সাথে!

➤ ট্রেনটা ভোঁ দিয়ে ছেড়ে দিল। রিনা জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখছে। কত কিছুই না দেখা যাচ্ছে— গাছ, বাড়ি, ইলেকট্রিক পোস্ট সবই ছুটে চলেছে ট্রেনের বিপরীত দিকে!

রিনার মতো তুমি কী কখনো ভেবেছ এরকম কেন মনে হয়? বাইরের গাছ, বাড়িগুলো কি সত্যি উলটো দিকে ছুটছে? আসলে, ট্রেনটা সামনের দিকে চলে, তাই তোমার এরকম মনে হয়।

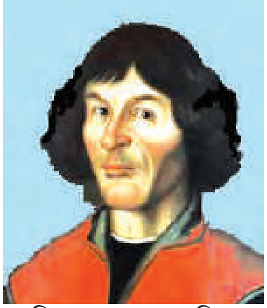

নিকোলাস কোপারনিকাস

তোমার মতোই আগেকার মানুষ মনে করত পৃথিবীটা এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে। আকাশের সূর্য, চাঁদ বা অন্য জ্যোতিষ্কের সরে যাওয়া দেখে মানুষ ভাবত পৃথিবীর চারিদিকে এরা ঘুরছে। পোল্যান্ডের জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপারনিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩ খ্রি.) প্রমাণ করেন —পৃথিবী নয়, সূর্যই সৌর জগতের কেন্দ্রে আছে। আর পৃথিবী নিজের অক্ষের চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে সূর্যের চারিদিকে পরিক্রমণ করছে।

প্রত্যেকদিন সূর্যকে আমরা পূর্ব দিকে উঠতে দেখি। সারাদিন আকাশ পরিক্রমা করে শেষে বিকেলবেলা পশ্চিম দিকে সূর্য অস্ত যায়। আসলে সূর্যের সামনে পৃথিবী নিজের অক্ষের চারিদিকে পশ্চিম থেকে পূর্বে পাক খায়। তাই সূর্যকে উলটো দিকে সরে যেতে দেখা যায়। সূর্যের এইরকম চলাচলকে সূর্যের দৈনিক আপাত-গতি বলে।

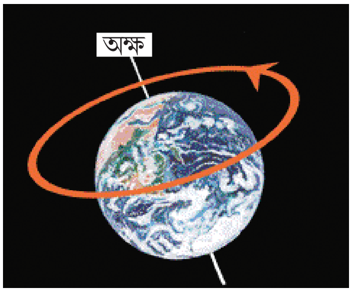

টেবিলের ওপর একটা বল বা লাট্টু ঘুরিয়ে দিলে কীরকম দেখাবে? মনে হবে মাঝখান দিয়ে একটা অদৃশ্য রেখা (অক্ষ) আছে, যাকে ঘিরে বলটা বা লাট্টুটা ঘুরপাক খাচ্ছে। পৃথিবীও এইভাবে নিজ অক্ষের চারিদিকে ঘুরছে।

পৃথিবী কক্ষতলের সঙ্গে ৬৬ $\frac{১}{২}^{\circ}$ কোণ করে হেলে, অক্ষের চারিদিকে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে অবিরামভাবে পাক খাচ্ছে। এটাই পৃথিবীর আবর্তন গতি।

একটা পাক শেষ করতে পৃথিবীর সময় লাগে ২৩ ঘ. ৫৬ মি. ৪ সে.। পৃথিবীর পরিধি প্রায় ৪০,০০০ কিমি। এই পরিমাণ পথ পৃথিবী পাড়ি দেয় ২৪ ঘণ্টায়। তাহলে ১ ঘণ্টায় পৃথিবী কতটা পথ পেরোয়, হিসেব করে ফেলো।

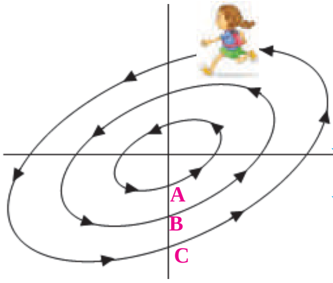

তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জোরে কে দৌড়োতে পারে? A, B ও C, তিনটে বিন্দু থেকে বৃত্তরেখাগুলো ধরে তিনজনকে দৌড় শেষ করতে হবে একই সময়ের মধ্যে। বলোতো কাকে সবচেয়ে বেশি জোরে দৌড়োতে হবে আর কাকে কম?

পৃথিবীর অক্ষরেখাগুলো নিরক্ষরেখা থেকে ক্রমশ মেরুর দিকে দৈর্ঘ্যে ছোটো হতে থাকে। তাই পৃথিবীকেও একটা পাক শেষ করতে হলে নিরক্ষরেখার কাছে সবচেয়ে বেশি জোরে ঘুরতে হয়। আর যত মেরুর দিকে যাওয়া যায় তত আবর্তনের বেগ কমতে থাকে।

বলোতো কোথায় পৃথিবীর আবর্তনের বেগ সবচেয়ে কম?

➢সূর্য বা অন্য তারা কেন পুব আকাশে আগে দেখা যায়?

মনে করো, তুমি নাগরদোলায় চড়েছ। কোনো বন্ধু নীচে দাঁড়িয়ে তোমাকে হাত নাড়ছে। নাগরদোলা ঘুরছে - তুমি প্রথমে বাড়ি, তারপর গাছ, তারপর আকাশ দেখতে পেলে। তারপর ঘুরে এসে আকাশ থেকে গাছ, গাছ থেকে বাড়ি, আবার বন্ধুকে দেখতে পেলে। এভাবে যতবারই নাগরদোলা ঘুরে আসছে তুমি পরপর জিনিসগুলো দেখতে পাচ্ছো - কেন? নাগরদোলাটা ঘুরছে বলেই তো। পৃথিবীও যেহেতু পশ্চিম থেকে পূর্বে পাক খাচ্ছে,তাই সূর্য, তারা পুব আকাশে আগে দেখা যায়।

দিন ও রাত

একটা অন্ধকার ঘরে গ্লোবের ওপর টর্চের আলো ফেলে দেখো গ্লোবের অর্ধেক অংশ আলোয় আর বাকি অর্ধেক অন্ধকারে আছে। গ্লোবটা পশ্চিম থেকে পূর্বে অর্থাৎ বামদিক থেকে ডানদিকে ঘোরালে দেখবে অন্ধকারে থাকা জায়গাগুলো আলোয় আসছে। আবার আলোকিত অংশ অন্ধকারে চলে যাচ্ছে। গোলাকার পৃথিবীর যে দিকটা সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে, সেদিকে হয় দিন। উলটো দিকটায় রাত।

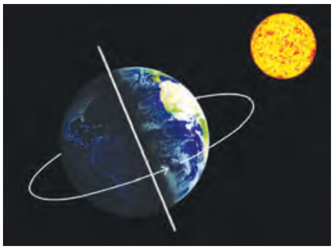

পৃথিবীও পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে পাক খাচ্ছে। আবর্তন গতির জন্য পৃথিবীর প্রতিটি জায়গা ২৪ ঘণ্টায় একবার করে সূর্যের আলোয় আসে, আবার রাতের অন্ধকারে ডুবে যায়।

অন্ধকার ঘরে টর্চের আলোয় গ্লোবকে ধীরে ধীরে ঘুরিয়ে দেখো — আলো আর অন্ধকারের মাঝে একটা স্পষ্ট সীমারেখা দেখতে পাবে। ওই সীমানা বরাবর যে বৃত্তরেখা তৈরি হয়, তা হলো ছায়াবৃত্ত (Line of Illumination)।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙলে দেখবে সূর্যোদয়ের আগে আকাশে হালকা আলোর আভা দেখা যায়। বিকেলে দেখবে সূর্য ডোবার পরও কিছুক্ষণ দিনের আলো থাকে। আলো থেকে অন্ধকার বা অন্ধকার থেকে আলোয় আসতে কিছু সময় লাগে। ছায়াবৃত্ত পৃথিবী পৃষ্ঠের যে জায়গার ওপর দিয়ে যখন যায় তখন সেখানকার আকাশে সূর্যকে দেখা যায় না। কিন্তু সূর্যের আভা দেখা যায়। সূর্যোদয়ের আগের সময় হলো **ঊষা** আর সূর্যাস্তের পর, সন্ধের আগের সময় হলো **গোধূলি**।

পৃথিবীর আবর্তন থেমে গেলে কী হবে?

পৃথিবীর অর্ধেক অংশে শুধুই দিন আর অন্য অর্ধেক অংশে হবে শুধুই রাত। পৃথিবী হয়ে উঠবে বসবাসের অযোগ্য।

➢ পৃথিবী মহাশূন্যে আবর্তন করছে। কিন্তু আমরা ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছি না কেন?

এর জন্য দায়ী পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ (Gravity)। পৃথিবী সবকিছুকেই নিজের কেন্দ্রের দিকে টেনে ধরে রেখেছে। এই মাধ্যাকর্ষণ টানের কথা প্রথম বলেন বিজ্ঞানী নিউটন।

➢ শুভদীপের ঠাকুমা ঘড়ি না দেখেও দিনের সময় আন্দাজ করতে পারেন। মিনিট, সেকেন্ড না মিললেও ঘণ্টাটা মিলে যায়। কী করে বলোতো?
— পুকুর পাড়ে নারকোল গাছের ছায়া দেখে।

ছাদে বা কোনো খোলা জায়গায়, যেখানে সূর্যের আলো ভালোভাবে পড়ে, সেখানে একটা নির্দিষ্ট জায়গা ঠিক করো। প্রতি ঘণ্টায় সেখানে দাঁড়াও। তোমার ছায়া কোন দিকে পড়ছে আর সেটা কতটা লম্বা হচ্ছে লক্ষ করো। দিনের কোন সময়ে তোমার ছায়া সবচেয়ে বড়ো আর কোন সময়ে সবচেয়ে ছোটো হয় দেখে, লিখে রাখো।

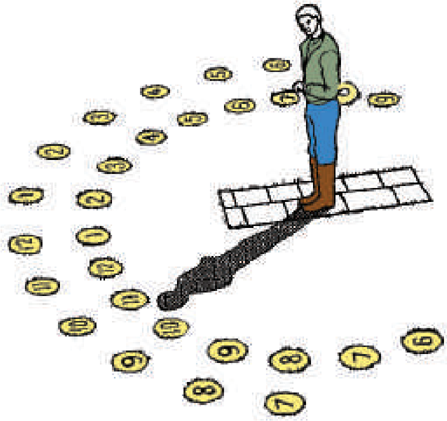

পৃথিবীর সময় চলে সূর্যের দৈনিক আপাত গতির সঙ্গে তাল রেখে। পৃথিবী নিজের অক্ষের চারিদিকে এক পাক শেষ করে প্রায় ২৪ ঘণ্টায়। ১ ঘণ্টা সময়কে সমান ৬০ ভাগে ভাগ করলে পাওয়া যায় ১মিনিট। আবার ১ মিনিট সময়কে সমান ৬০ ভাগে ভাগ করলে পাওয়া যায় ১ সেকেন্ড।

ভেবে দেখো !

- এখন কটা বাজে ?
- এই সময়টা কোন জায়গার ?

— তোমার শহরের, তোমার দেশের না গোটা পৃথিবীর ?

এখন আমাদের ঘড়িতে যা সময়, জাপানের টোকিও বা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোর ঘড়ি কি একই সময় দেখাবে ?

- আজকের তারিখ কত ?
- তারিখটা কোথাকার — তোমার দেশের, তোমার শহরের, না গোটা পৃথিবীর ?
- তারিখটা শুরু হলো কোথা থেকে ? অর্থাৎ পৃথিবীর ঠিক কোন জায়গা থেকে শুরু হয় নতুন দিন ?

- তুমি রাতে কতক্ষণ ঘুমোও ?
- স্কুলের পোশাক পরে তৈরি হতে তোমার কতক্ষণ সময় লাগে ?
- স্কুলে ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম বিজয়ী কতক্ষণে তার দৌড় শেষ করেছে ?

— এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার সময় ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ড কোথায় কোনটা ব্যবহার করছ খেয়াল করো।

অবাক কাণ্ড !!

ফার্দিনান্দ ম্যাগেলান ও তাঁর সঙ্গীরা ১৫১৯ সালে পৃথিবী প্রদক্ষিণের অভিযান শুরু করেন। অভিযান শেষে প্রায় তিন বছর পর দেশে ফিরে তাঁরা একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করলেন তাঁদের হিসাবের সঙ্গে দেশের ক্যালেন্ডার মিলছে না ! অর্থাৎ তাদের হিসাবে সেদিন যদি সোমবার হয়, দেশে তখন মঙ্গলবার চলছে। হিসাবে কোনো ভুল হয়নি, তাহলে পুরো একটা দিন কোথায় গেলো ?

- পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্বে ২৪ ঘণ্টায় একবার পাক খাচ্ছে। তাই সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয়। পৃথিবীর পূর্ব দিকের জায়গায় সময় এগিয়ে থাকে। যত পশ্চিমে যাওয়া যায় সময় পিছিয়ে যায়।
- ৩১ ডিসেম্বর সন্ধে নাগাদ টিভিতে দেখবে অস্ট্রেলিয়ার মানুষ রাত ১২টা বেজে যাওয়ায় ১ জানুয়ারির নববর্ষ উপভোগ করছে। কারণ

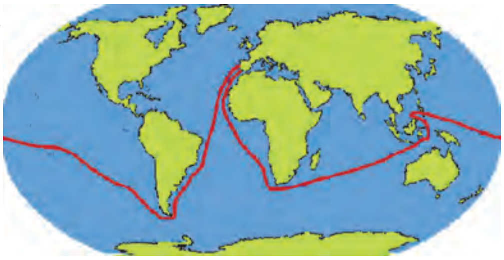

ম্যাগেলানের যাত্রাপথ

অস্ট্রেলিয়া অনেক পূর্বের দেশ। আবার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে তখন ৩১ ডিসেম্বর সকালবেলা।

কিন্তু পৃথিবী ঘোরার সাথে সাথে তুমি যদি জাহাজে বা প্লেনে করে একই দিকে বা উলটো দিকে যেতে থাকো, তাহলে কী হবে?

➤ পূর্বদিক থেকে পশ্চিম দিকে যেতে থাকলে, সময় ক্রমশ পিছিয়ে যাবে। অর্থাৎ একই দিনের আগের সময়ে পৌঁছে যাবে। আর পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে যেতে থাকলে সময় এগিয়ে যাবে।

➤ এইসব সমস্যা সমাধানের জন্য মূলমধ্যরেখার ঠিক বিপরীত দিকে ১৮০° দ্রাঘিমারেখা অনুসরণ করে 'আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা' ঠিক করা হয়েছে। এখান থেকেই শুরু হয় নতুন তারিখ। ২৪ ঘণ্টা পরে সেই তারিখ ঘুরে এসে আবার এখানে এসেই শেষ হয়। জাহাজ বা প্লেনে করে এই রেখা পেরিয়ে পশ্চিম গোলার্ধে গেলে একদিন কমিয়ে নিতে হয়। আবার পূর্ব গোলার্ধে গেলে একদিন বাড়িয়ে নিতে হয়। এক্ষেত্রে কিন্তু সময়ের কোনো পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ তোমার ঘড়িতে যদি তখন বিকেল ৪ টে বাজে, তাহলে তারিখ রেখা পার হবার ঠিক পরে বিকেল ৪ টেই থাকবে। শুধু পাল্টে যাবে তারিখটা!

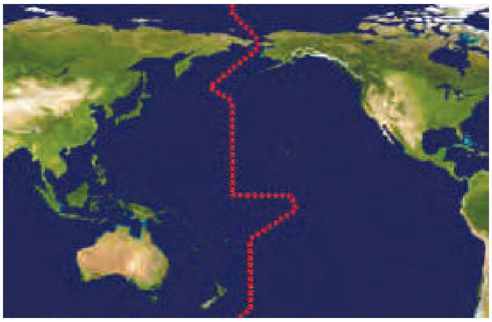

আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা

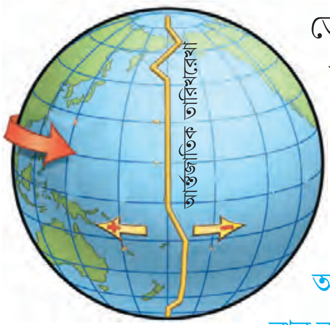

খুঁজে লেখো —

আন্তর্জাতিক তারিখ রেখাকে মানচিত্রে খুঁজে বার করো। কোন কোন দেশ, দ্বীপ, দ্বীপপুঞ্জ; নতুন দিন, নতুন মাস বা নতুন বছরকে প্রথম পায় তার একটা তালিকা তৈরি করো।

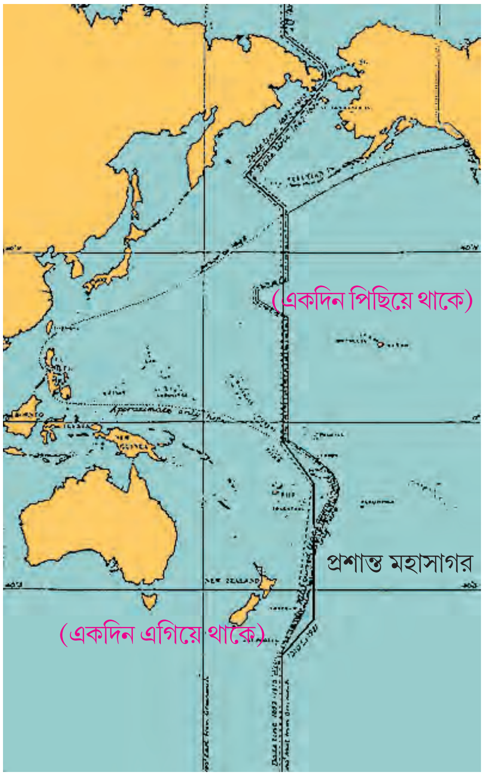

আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা

মগজাস্ত্র!

➤ প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে ১৮০° দ্রাঘিমাকে অনুসরণ করে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখাকে কল্পনা করা হয়েছে, কিন্তু কোথাও কোথাও এই রেখাকে বাঁকিয়ে দেওয়া হয়েছে কেন?

➤ গ্লোব দেখে বলোতো– আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার কোন দিকে পূর্ব গোলার্ধ আর কোন দিকে পশ্চিম গোলার্ধ?

➢ কোনো দ্রাঘিমারেখায় মাথার ওপর যখন সূর্য আসে, তখন ওই দ্রাঘিমারেখায় অবস্থিত প্রত্যেকটি জায়গায় সময় হয় দুপুর ১২টা। সেই কারণে দ্রাঘিমারেখাকে Meridian বলে। Meridian একটি ল্যাটিন শব্দ যার অর্থ Midday বা মধ্যাহ্ন। মধ্যাহ্ন বা দুপুর ১২টা থেকে যে সময় গণনা করা হয় তা হলো কোনো স্থানের স্থানীয় সময়। দ্রাঘিমা বদলে গেলে স্থানীয় সময় (Local Time) বদলে যায়। একটা দেশে রেল চলাচল এবং অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটাই সময় না থাকলে অসুবিধা হয়। তাই দেশের মাঝখানের কোনো দ্রাঘিমারেখার স্থানীয় সময়কে সারা দেশের প্রমাণ সময় (Standard Time) বলে ধরে নেওয়া হয়। ভারতের ৮২°৩০′ পূঃ দ্রাঘিমার স্থানীয় সময়ই ভারতের প্রমাণ সময়।

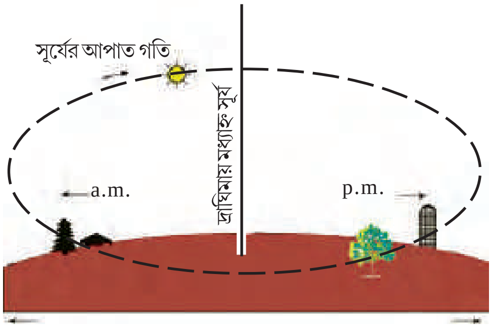

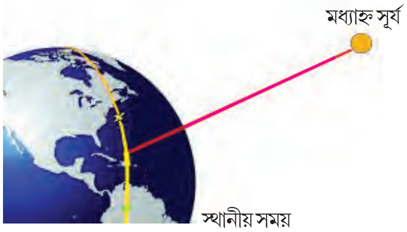

➢ বেশিরভাগ রেলস্টেশন বা এয়ারপোর্টে 24 ঘণ্টার ঘড়ি ব্যবহার করা হয়। তাতে রাত ৩ টে দেখানো হয় 03:00 hrs. আর দুপুর ৩ টে 15:00 hrs.। দুপুর ১২ টাকে 12:00 hrs. ও রাত ১২ টাকে 00:00 hrs. দেখানো হয়। রাত ১২টা থেকে দুপুর ১২টার আগে পর্যন্ত সময়কে a.m. (Ante Meridian) আর দুপুর ১২টা থেকে রাত ১২ টার আগে পর্যন্ত সময়কে p.m. (Post Meridian) হিসাবে ধরা হয়। সুতরাং 3 a.m. বললে রাত ৩টে আর 3 p.m. বললে দুপুর ৩টে কে বোঝায়।

বলতে পারো —

➢ স্টেশনের ঘড়িতে 20:00 hrs মানে সাধারণ ঘড়িতে তখন কটা বাজবে?

➢ আর কোথায় এরকম ধরনের ঘড়ি দেখেছ ?

৫

জল-স্থল-বাতাস

আমাদের মাথার ওপর ‘আকাশ’ নামের ছাদটা কত উঁচুতে আছে, কীরকম, কী দিয়ে তৈরি, কেনই বা দিনের বেলায় নীল, আর রাতের বেলা কালো হয়ে যায়...

জানতে ইচ্ছে করে?

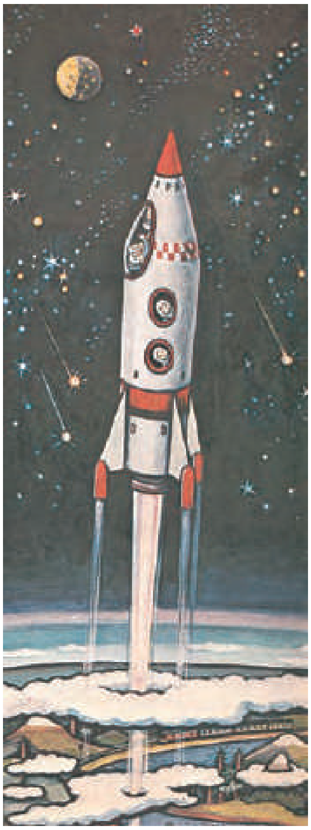

— তাহলে চলো, রকেটে করে পাড়ি দেওয়া যাক।

প্রবল শব্দে রকেট যাত্রা শুরু করল—জানালার বাইরে পৃথিবীটা ধীরে ধীরে নীচে নেমে যাচ্ছে—দেয়ালে টাঙানো যন্ত্রের কাঁটা উচ্চতা মাপছে—‘১কিমি...২কিমি’... এই বুঝি মেঘের গায়ে ধাক্কা লাগে! চারিদিকে তুলোর মতো মেঘ — তারই ফাঁক দিয়ে নীচে দেখা যাচ্ছে ছোটো ছোটো বাক্স-র মতো ঘরবাড়ি!

আরও উপরে...উচ্চতা এখন ‘১০ কিমি’! না, ঘরবাড়ি—বনজঙ্গল কিছুই আর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। মেঘের স্তর এখন অনেক নীচে, আর মাথার ওপর আকাশটা এখন ঝক্‌ঝকে ঘন নীল—

এবার হয়তো ‘ছাদটা’ একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছে! কিন্তু কী কাণ্ড! ঘন নীল আকাশটা এখন গাঢ় বেগুনি! উচ্চতা ‘৮০ কিমি’—আকাশ প্রায় মিশকালো —ঠিক যেন রাতের আকাশ! অথচ আকাশে একদিকে সূর্য, আর সূর্যের পাশেই চাঁদ তারাও দেখা যাচ্ছে!

কী ঘটল! নীল আকাশটা কোথায় গেল? মাথার ওপর, আশেপাশে, কোথাও নেই। তবে কি নীচে?—আশ্চর্য! নীল আকাশটা পায়ের নীচে! আর পৃথিবীটা একটা ঝকঝকে নীল-সাদা গোলকের মতো ভাসছে কালো আকাশে।

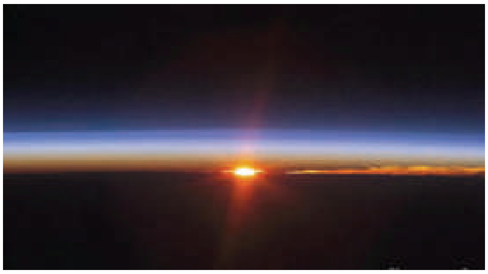

- নীল আকাশটার ওপারে, কালো আকাশটা সবসময়ই আছে। দিনের বেলা নীল আকাশটা তাকে আড়াল করে রাখে। আসলে নীল আকাশটা হলো, **পৃথিবীকে ঘিরে থাকা বায়ুর স্তর**। বাতাসে প্রচুর ধুলোর কণা, জলের কণা ভেসে বেড়ায়। দিনের বেলা, এগুলোয় ধাক্কা খেয়ে সূর্যের আলো সাত রং-এ ভেঙে যায়। এর মধ্যে নীল রংটা সবথেকে বেশি করে আকাশজুড়ে বিচ্ছুরিত হয়। তাই আকাশকে নীল দেখায়।

পৃথিবীর গায়ে চাদরের মতো লেগে থাকা বায়ুস্তরই হলো বায়ুমণ্ডল। পৃথিবী সৃষ্টির সময়ে কিছু গ্যাস, পৃথিবীর আকর্ষণে পৃথিবীর চারদিকে আটকে পড়ে। ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১০,০০০ কিমি পর্যন্ত বাতাসের অস্তিত্ব থাকলেও ৯৭ ভাগ বাতাসই আছে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রথম ২৭ কিমির মধ্যে। অনেকগুলো গ্যাস মিশে আছে বায়ুমণ্ডলে। বেশির ভাগটাই নাইট্রোজেন (ওজন হিসাবে শতকরা প্রায় ৭৮ ভাগ), আর অক্সিজেন (শতকরা প্রায় ২১ ভাগ)। এছাড়া আর্গন, মিথেন, হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, নিয়ন, ওজোন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, জলীয় বাষ্পও আছে।

বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাস

- ভূপৃষ্ঠ থেকে ওপরে ১৬ কিমি পর্যন্ত যে বায়ুস্তর আছে, তার নাম ট্রপোস্ফিয়ার। এই বায়ুস্তরে ধুলোর কণা, জলকণা থাকে বলে মেঘ, ঝড়, বৃষ্টি হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় আবহাওয়ার রকমফের দেখা যায়। ট্রোপোস্ফিয়ার স্তরে যত উঁচুতে ওঠা যায় তাপমাত্রা তত কমতে থাকে। প্রতি ১০০০ মিটার উচ্চতায় ৬.৪° সে. হারে তাপমাত্রা কমে।

- ট্রপোস্ফিয়ারের ওপরে, ভূপৃষ্ঠ থেকে ৫০ কিমি পর্যন্ত বায়ুস্তর হলো স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার। এখানে বাতাসের পরিমাণ কম, ধুলোর কণা, জলকণা নেই; তাই মেঘ, বৃষ্টি কিছুই হয় না। জেটপ্লেনগুলো এই শান্ত স্তর দিয়ে চলাচল করে। এখানে উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। এই স্তরে ২০-২৫ কিমি উচ্চতায় ওজোন গ্যাসের একটা স্তর আছে। সূর্য থেকে আসা ক্ষতিকারক অতিবেগুনি রশ্মি থেকে আমাদের রক্ষা করে এই স্তর।

- স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের ওপরে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৮০ কিমি পর্যন্ত মেসোস্ফিয়ার। এই স্তরে উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা কমতে থাকে। এরপর প্রায় ৩০০ কিমি পর্যন্ত থার্মোস্ফিয়ার। এখানে বাতাস প্রায় নেই। তাই আকাশকে কালো দেখায়। এই স্তরের আরেক নাম আয়নোস্ফিয়ার। অতিবেগুনি রশ্মির কারণে এই স্তরের তাপমাত্রা ২০০°সে-এ পৌঁছে যায়। এই স্তর থেকে বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে, তাই আমরা রেডিয়ো শুনতে পাই।

- থার্মোস্ফিয়ারের পরে আছে এক্সোস্ফিয়ার। তারপরে আছে সীমাহীন মহাকাশ। কৃত্রিম উপগ্রহ, মহাকাশ স্টেশন এই স্তরে থাকে।

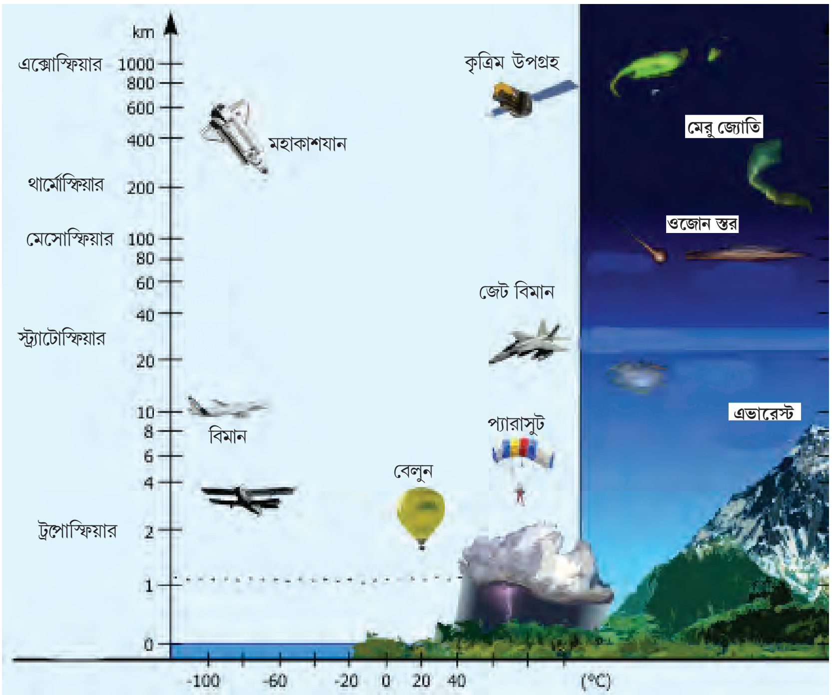

বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাস

বায়ুমণ্ডল না থাকলে কী হতো?

- পৃথিবীকে ঘিরে বায়ুর স্তর না থাকলে অন্যান্য গ্রহের মতোই পৃথিবীও প্রাণহীন হয়ে যেত। বাতাস ছাড়া উদ্ভিদ, প্রাণী কেউই কি বাঁচতে পারতো?

- দিনের বেলা সূর্যের তাপে পৃথিবী উত্তপ্ত হয় আর রাতের বেলা ঐ তাপ ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়। বায়ুমণ্ডল না থাকলে সূর্যাস্তের পর হঠাৎ ভীষণ ঠান্ডা আর সূর্যোদয়ের পর হঠাৎ প্রবল গরম হয়ে যেত পৃথিবী। বায়ুমণ্ডলের জন্যই পৃথিবীতে জীবনধারণের অনুকূল তাপমাত্রা বজায় থাকে।

- প্রতিদিন প্রায় ১০ হাজার কোটি ছোটো ছোটো উল্কা পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে। কিন্তু বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে ঘষা লেগে জ্বলে ছাই হয়ে যায়। তাই পৃথিবীর কোনো ক্ষতি হয় না।

বায়ুমণ্ডলের গুরুত্ব সম্পর্কে তুমি আরও যা যা জানো ভেবে নিয়ে লিখে ফেলো—

'বিশ্বভরা প্রাণ'

মহাবিশ্বে অসংখ্য গ্রহ তারার মধ্যে সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা এই পৃথিবীই আমাদের বাসভূমি। পৃথিবী কিন্তু চিরকাল এখনকার মতো ছিল না। প্রায় ৪৬০ কোটি বছর আগে সৃষ্টির সময়ে পৃথিবী ছিল একটা জ্বলন্ত গ্যাসীয় পিণ্ড।

জল, স্থল, বায়ুমণ্ডল—কিছুই ছিল না। ক্রমে কোটি কোটি বছর ধরে তাপ বিকিরণ করে পৃথিবী ধীরে ধীরে ঠান্ডা হতে শুরু করে। এইসময় কিছু গ্যাস আর জলীয়বাষ্প পৃথিবীর আকর্ষণে পৃথিবীর চারিদিকে ভাসতে থাকে। পৃথিবীর বাইরের অংশ জমাট বেঁধে একটা কঠিন আস্তরণ তৈরি করে। কিন্তু ভিতরের অংশ, উত্তপ্ত অবস্থাতেই (২০০০° সে.- ৪০০০° সে.) থেকে যায়।

পৃথিবী — সৃষ্টি থেকে বর্তমান অবস্থা

● পৃথিবীর সবথেকে বাইরের পাতলা শক্ত আস্তরণটা ভূ-ত্বক (Crust) মাঝের অংশটা গুরুমণ্ডল (Mantle) আর ভিতরে রয়েছে কেন্দ্রমণ্ডল (Core)।

ভূ-ত্বকের চারভাগের একভাগ মাত্র স্থল। স্থলভাগ মূলত শিলা আর মাটি দিয়ে তৈরি। তাই একে শিলামণ্ডল (Lithosphere) বলা হয়। হাজার হাজার বছর ধরে শিলা ক্ষয় পেয়ে চূর্ণ হয়ে মাটি তৈরি হয়।

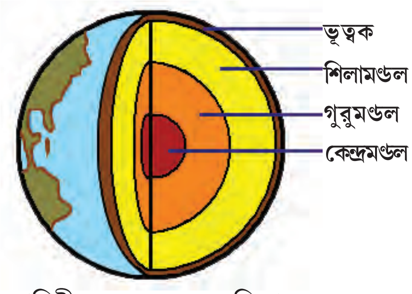

পৃথিবীর অভ্যন্তরের স্তরবিন্যাস

● উদ্ভিদ, প্রাণী, মানুষ সবারই জীবন-মৃত্যু স্থলভাগের ওপর নির্ভরশীল। মাটি থেকে পুষ্টি নিয়ে উদ্ভিদ খাদ্য তৈরি করে। আর প্রাণীরা উদ্ভিদের তৈরি খাদ্যের ওপরে নির্ভর করে।

● শিলামণ্ডল থেকে আমরা বিভিন্ন দরকারি ধাতু ও খনিজ পদার্থ (লোহা, তামা, সোনা, অ্যালুমিনিয়াম, চুনাপাথর, মার্বেল, জিপসাম) পাই।

● মাটির নীচের কয়লা, খনিজতেল, প্রাকৃতিক গ্যাস জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

● সৃষ্টির বহু কোটি বছর পর পৃথিবীর বাইরেটা বেশ ঠান্ডা হয়ে আসে। তখন আকাশের রাশি রাশি জলীয়বাষ্প ঠান্ডা হয়ে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মতো পৃথিবীতে নেমে আসে। হাজার হাজার বছর ধরে সেই প্রবল বৃষ্টির জলে পৃথিবীর নীচু জায়গাগুলো ভরাট হয়ে সাগর মহাসাগর তৈরি হয়। পৃথিবীর এই বিশাল জলভাণ্ডারের নাম বারিমণ্ডল (Hydrosphere)।

● পৃথিবীর চারভাগের তিনভাগই জল। তাই মহাকাশ থেকে পৃথিবীকে ঝলমলে নীল গোলকের মতো দেখায়। সৌরজগতের আর কোনো গ্রহে এত বিশাল পরিমাণ জল পাওয়া যায় না। তাই পৃথিবীকে ‘নীল গ্রহ’ বলা হয়।

জলই জীবন। জল ছাড়া পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। নদী, সমুদ্র, জলাশয় মাছ ও অন্যান্য জীবের আবাসস্থল। সমুদ্রের জলে কিছু দরকারি খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। সমুদ্র পৃথিবীর সমস্ত মহাদেশগুলোকে জলপথে যুক্ত করেছে। জলচক্র পৃথিবীর তাপমাত্রাকে জীবনধারণের অনুকূলে রাখে ।

● প্রায় ৩৫০ কোটি বছর আগে জলেই পৃথিবীর প্রথম প্রাণের আবির্ভাব হয়েছিল।

এখনও পর্যন্ত পৃথিবী ছাড়া সৌরজগতের আর কোনো গ্রহে জলের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। পৃথিবীর মোট জলের শতকরা ৯৭ ভাগই আছে সমুদ্রে। বাকি শতকরা ৩ ভাগ জল আছে নদী, জলাশয়, হ্রদ, হিমবাহ এবং মাটির নীচের জল রূপে।

● আমাদের রোজকার জীবনে জল কী কী কাজে লাগে তার একটা তালিকা তৈরি করো।

একটা থালায় অল্প জল নিয়ে রোদে রেখে দাও। কয়েক ঘণ্টা পর লক্ষ করো জলের পরিমাণ আগের থেকে কমে গেছে না একই আছে?

সূর্যের তাপে নদ-নদী, জলাশয়, সমুদ্র থেকে জল বাষ্প হয়ে বাতাসে মেশে। জলীয় বাষ্প বাতাসের থেকে হালকা। জলীয়বাষ্পযুক্ত বাতাস ওপরের দিকে উঠে যায়। ওপরের ঠান্ডা বায়ুস্তরের সংস্পর্শে জলীয় বাষ্প ঠান্ডা হয়ে জলকণায় পরিণত হয় এবং ধূলিকণাকে আশ্রয় করে মেঘ হয়ে ভেসে বেড়ায়। অনেকগুলো জলকণা একসঙ্গে জুড়ে গিয়ে বড়ো জলকণায় পরিণত হয়। আরো ওপরে উঠলে ওই জলকণা ঠান্ডার সংস্পর্শে বরফকণায় পরিণত হয়। বাতাসের থেকে ভারী বলে তা আর ভেসে বেড়াতে পারে না। বৃষ্টি বা তুষার রূপে পৃথিবীতে নেমে আসে। এই বৃষ্টির জল নদী বা সমুদ্রে ফিরে আসে। সূর্যের তাপে আবার তা বাষ্প হয়ে বাতাসে মেশে।

- এইভাবে জল কখনও মেঘ, কখনও বৃষ্টি আবার কখনও কঠিন বরফ, তুষার রূপে আকাশ আর পৃথিবীর মধ্যে ক্রমাগত আবর্তিত হয়ে চলেছে। জলের এই চক্রাকার আবর্তন হলো 'জলচক্র'। জলচক্রের মাধ্যমেই পৃথিবীতে জলকে কঠিন, তরল এবং বাষ্পীয়—এই তিন অবস্থাতেই পাওয়া যায়।

'জলচক্রের' পরীক্ষা করে দেখো

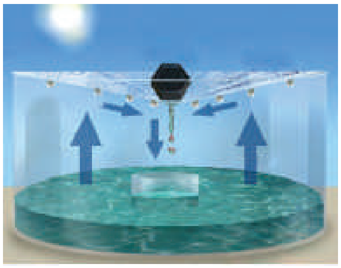

একটা বড়ো কাচের পাত্রে কিছুটা জল দিয়ে ভরতি করো। পাত্রের ভিতরে একটা ছোটো কাচের বাটি মাঝামাঝি এমনভাবে বসিয়ে দাও যাতে বাটিটা জলে না ডোবে। পাত্রের মুখটা একটা পলিথিন দিয়ে ভালো করে ঢেকে সুতো দিয়ে বেঁধে দাও। ওর ওপর মাঝখানে একটা ছোটো নুড়ি রেখে দাও। পাত্রটা রোদে রেখে দিয়ে কিছুক্ষণ পর পর লক্ষ করে দেখো কী কী হয়। পুরো ব্যাপারটার কারণ-ফলাফল বুঝে নিয়ে লিখে ফেলার চেষ্টা করো।

মহাদেশ সঞ্চরণ

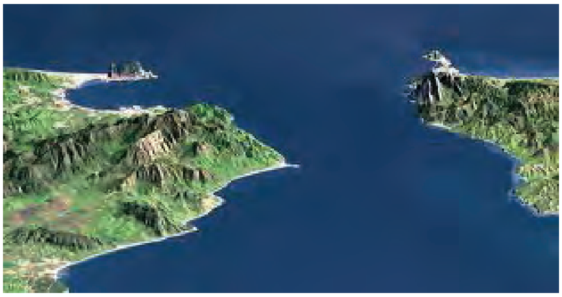

আমাদের পায়ের নীচের মাটিটা স্থির নয়। আসলে মহাদেশগুলোই স্থির নয়। খুব ধীর গতিতে তারা কোথাও পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আবার কোথাও পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে। কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে মহাদেশগুলো বছরে ২-২০ সেমি. করে সরছে। একবছরে খুব কম হলেও লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মহাদেশের এই সঞ্চরণের ফলে পৃথিবীর মানচিত্রে বড়ো ধরনের পরিবর্তন ঘটে যায়।

৫০ কোটি বছর আগে পৃথিবীর মানচিত্রটা এখনকার মতো ছিল না। একটাই বিরাট অখণ্ড স্থলভাগ বা মহা-মহাদেশ ছিল, যার নাম 'প্যানজিয়া' আর 'প্যানজিয়ার' চারদিকে ছিল বিরাট জলভাগ বা মহা-মহাসাগর, নাম 'প্যানথালাসা'।

২০ কোটি বছর আগে 'প্যানজিয়া' ভাঙতে শুরু করে। ভাঙা টুকরোগুলো উত্তর-দক্ষিণে, পূর্ব-পশ্চিমে সরে যেতে থাকে। পৃথিবীর ভিতরের প্রচণ্ড তাপে গুরুমণ্ডলে পরিচলন স্রোতের সৃষ্টি হয়। এই পরিচলন স্রোতই মহাদেশ সঞ্চরণের মূল কারণ।

- একটা স্বচ্ছ পাত্রে জল ফোটার সময় কতগুলো রঙিন কাগজের টুকরো জলে ফেলে দিয়ে লক্ষ করো। পাত্রের তলার জল গরম হয়ে ওপরে উঠে ছড়িয়ে পড়বে। ওপরের ঠান্ডা জল তলার দিকে নেমে যাবে। কাগজের টুকরোগুলোকে লক্ষ করলেই 'পরিচলন স্রোত' বুঝতে পারবে।

এই পরিচলন স্রোতে 'প্যানজিয়ার' ভাঙা টুকরোগুলো পরস্পর দূরে সরে যায়। কোটি কোটি বছর পরে বর্তমান অবস্থানে এসে সাতটা মহাদেশ এবং পাঁচটা মহাসাগর তৈরি করেছে।

অবাক কাণ্ড!

পৃথিবীর বর্তমান মানচিত্রটা ভালো করে লক্ষ করো। দক্ষিণ আমেরিকার পূর্বদিক আর আফ্রিকার পশ্চিমদিকের মধ্যে কোনো মিল পাওয়া পাওয়া যাচ্ছে?... যেন একটা অন্যটার ভেঙে যাওয়া অংশ।

কাজে লেগে পড়ো: পৃথিবীর মানচিত্রটা ভালো করে দেখে, এরকম আর কোথায় কোথায় মিল পাওয়া যাচ্ছে চটপট ধরে ফেলতে হবে।

কী হতে পারে?

আরো ১০ কোটি বছর পর পৃথিবীর মানচিত্রটা একেবারেই অন্যরকম দেখাবে। উত্তর আর দক্ষিণ আমেরিকা আরো পশ্চিমে সরে এশিয়ার ভূখণ্ডে ধাক্কা খাবে, আটলান্টিক মহাসাগর আরো বড়ো হবে, আর প্রশান্ত মহাসাগরটা থাকবেই না! আফ্রিকার পূর্বদিকটা আরো উত্তর-পূর্বে সরে গিয়ে জুড়ে যাবে ভারতের সঙ্গে!

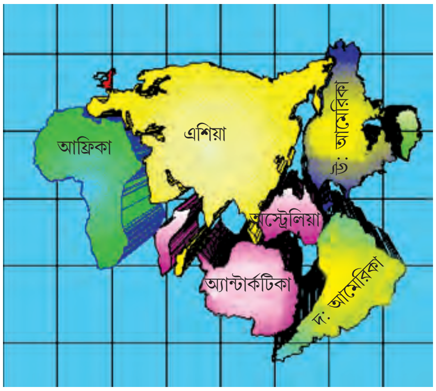

মহাদেশগুলির ভবিষ্যৎ অবস্থান

সাত মহাদেশ পাঁচ মহাসাগর

উত্তর আমেরিকা

- তৃতীয় বৃহত্তম মহাদেশ।
- প্রধান পর্বতশ্রেণি — রকি।
- প্রধান নদী— মিসিসিপি-মিসৌরি।
- ২৩টি দেশ আছে।

ইউরোপ

- ষষ্ঠ বৃহত্তম মহাদেশ।
- ইউরোপ এবং এশিয়া দুটো মহাদেশকে একত্রে 'ইউরেশিয়া' বলে।
- প্রধান পর্বতশ্রেণি—আল্পস্।
- প্রধান নদী—দানিয়ুব , রাইন।
- ৪৫টি দেশ আছে।

এশিয়া

- বৃহত্তম, জনবহুল মহাদেশ।
- প্রধান পর্বত শ্রেণি—হিমালয়
- প্রধান নদী—ইয়াংসিকিয়াং, ভলগা, ওব, ইনিসি, ।
- ৪৪ টি দেশ আছে।

দক্ষিণ আমেরিকা

- চতুর্থ বৃহত্তম মহাদেশ।
- বৃহত্তম নদী—আমাজন।
- শুষ্কতম শীতল মরুভূমি—প্যাটাগোনিয়া।
- প্রধান পর্বতশ্রেণি— আন্দিজ।
- ১৩ টি দেশ আছে।

আন্টার্কটিকা

- দক্ষিণ মেরুকে ঘিরে আছে পঞ্চম বৃহত্তম মহাদেশ।

আফ্রিকা

- দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ।
- বৃহত্তম উষ্ণ মরুভূমি সাহারা।
- নীলনদ পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী।
- প্রধান পর্বতশ্রেণি—আটলাস।
- ৫৪টা দেশ আছে।

ওশিয়ানিয়া

- ক্ষুদ্রতম মহাদেশ।
- দক্ষিণ গোলার্ধে চারদিক সমুদ্র বেষ্টিত।
- অস্ট্রেলিয়া,নিউজিল্যান্ড এবং অনেকগুলো দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে গঠিত।
- প্রধান পর্বতশ্রেণি— গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ।
- প্রধান নদী—মারে- ডার্লিং।

সুমেরু মহাসাগর: উত্তর মেরুর চারদিকে— ক্ষুদ্রতম মহাসাগর।

প্রশান্ত মহাসাগর : **বৃহত্তম মহাসাগর** —পৃথিবীর প্রায় অর্ধাংশ জুড়েই এর বিস্তার।

আটলান্টিক মহাসাগর : **দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগর।** পশ্চিমে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং পূর্বে ইউরোপ ও আফ্রিকার মাঝে অবস্থিত।

ভারত মহাসাগর: **তৃতীয় বৃহত্তম মহাসাগর।**

কুমেরু মহাসাগর : প্রশান্ত, আটলান্টিক এবং ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ প্রান্ত এই নামে পরিচিত।

বিশেষ বৈশিষ্ট্য

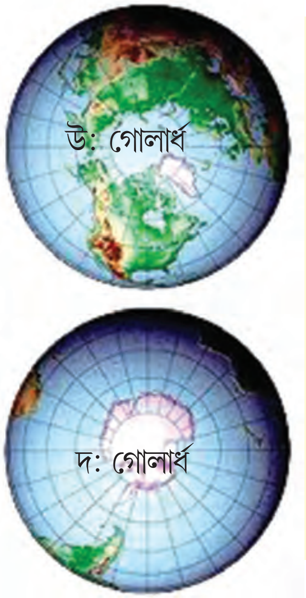

পৃথিবীর জলভাগের পরিমাণ ৭১ শতাংশ এবং স্থলভাগের পরিমাণ ২৯ শতাংশ। পৃথিবীর মহাসাগরগুলো পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। তাই পৃথিবীর সর্বত্র সমুদ্র জলতল প্রায় সমান হয়। একারণে উচ্চতা বা গভীরতা মাপার সময় গড় সমুদ্রতলের সাপেক্ষে মাপা হয়।

- উত্তর গোলার্ধে জলভাগ এবং স্থলভাগের পরিমাণ প্রায় সমান হলেও দক্ষিণ গোলার্ধে স্থলভাগের থেকে জলভাগের পরিমাণ প্রায় ১৫ শতাংশ বেশি।

- মানচিত্র ভালো করে লক্ষ করলে দেখবে ... সুমেরু মহাসাগরকে ঘিরে রয়েছে বিস্তৃত স্থলভাগ— এশিয়া, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা। বিপরীত দিকে আন্টার্কটিকা মহাদেশের চারদিকে প্রশান্ত, আটলান্টিক, ভারত মহাসাগরের বিস্তৃত জলভাগ রয়েছে।

মহাদেশ ও মহাসাগরের এরকম আরো কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য খুঁজে বার করে লিখে রাখো।

জল- স্থল - বাতাস :

বারিমণ্ডল-শিলামণ্ডল-বায়ুমণ্ডল

একত্রে পৃথিবীতে এমন এক আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, যেখানে জীবনের আবির্ভাব, বিকাশ, বৈচিত্র্য—সবই সম্ভব হয়েছে।

জল, স্থল, বাতাসে ছড়িয়ে থাকা প্রায় ৩৫ হাজার প্রজাতির উদ্ভিদ এবং ১৫ লক্ষ প্রজাতির প্রাণী নিয়ে তৈরি হয়েছে পৃথিবীর জীবমণ্ডল (Biosphere)

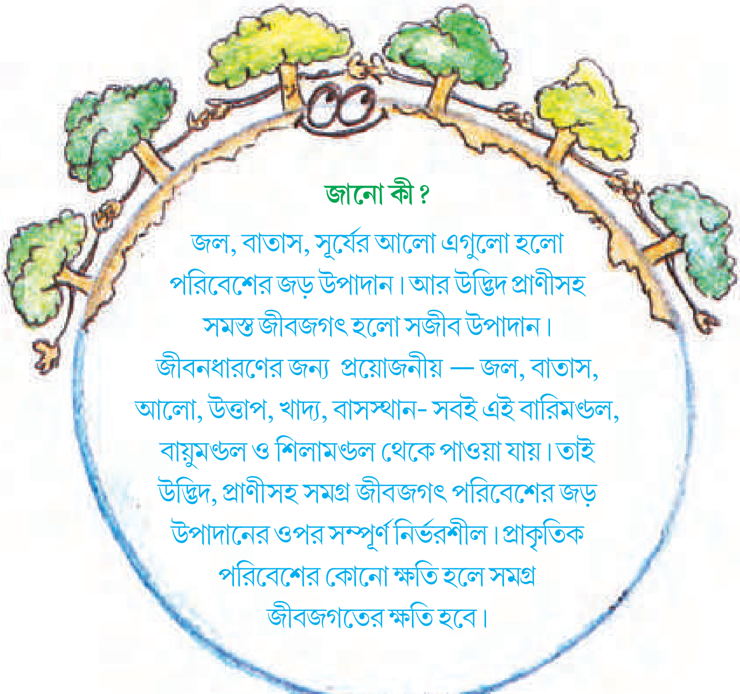

জানো কী ?

জল, বাতাস, সূর্যের আলো এগুলো হলো পরিবেশের জড় উপাদান। আর উদ্ভিদ প্রাণীসহ সমস্ত জীবজগৎ হলো সজীব উপাদান। জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় — জল, বাতাস, আলো, উত্তাপ, খাদ্য, বাসস্থান- সবই এই বারিমণ্ডল, বায়ুমণ্ডল ও শিলামণ্ডল থেকে পাওয়া যায়। তাই উদ্ভিদ, প্রাণীসহ সমগ্র জীবজগৎ পরিবেশের জড় উপাদানের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক পরিবেশের কোনো ক্ষতি হলে সমগ্র জীবজগতের ক্ষতি হবে।

পরিবেশ ও মানুষ

মানুষ জীবমণ্ডলের একটা অংশমাত্র অথচ মানুষেরই কিছু কাজকর্ম পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে।

- জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বনজঙ্গল ধ্বংস করে শিল্প স্থাপন, কৃষিকাজ, বসতি নির্মাণ, প্রচুর পরিমাণে খনিজ তেল, কয়লা, কাঠ পোড়ানো — এসবের ফলে জল, মাটি, বাতাস সবই দূষিত হয়ে যাচ্ছে।
- যানবাহন এবং শিল্প-কারখানা থেকে বিষাক্ত গ্যাস বাতাসে মিশছে। এই গ্যাসগুলো পৃথিবীর চারিদিকে এমন এক আবরণ তৈরি করে যাতে পৃথিবী থেকে ফিরে যাওয়া তাপ আটকে পড়ে। দিনের পর দিন এই তাপ পৃথিবীর উষ্ণতাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। একে 'বিশ্ব উষ্ণায়ন' বলে। ফলে মেরুর বরফ গলে গিয়ে সমুদ্র জলতলের উচ্চতা বেড়ে চলেছে। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে প্রবল বন্যা, তীব্র খরা, বিধ্বংসী ঝড়, মরুভূমির প্রসার, তাপপ্রবাহ এমনকি শস্যহানী থেকে দুর্ভিক্ষ, মহামারি পর্যন্ত হতে পারে।

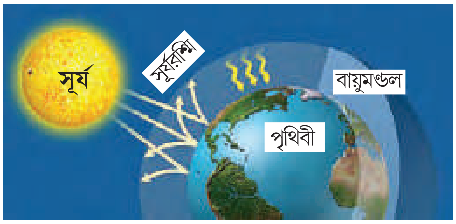

- ফ্রিজ, এ.সি., বেশকিছু রাসায়নিক দ্রব্য থেকে ক্ষতিকর গ্যাস বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরে পৌঁছে আমাদের এই রক্ষাকবচকে নষ্ট করে দিচ্ছে।
- ধীরে ধীরে জলবায়ু এমনভাবে পালটে যাচ্ছে যে বহু উদ্ভিদ এবং প্রাণী প্রজাতি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতির এই অবক্ষয় আটকাতে এখনই কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা না নিলে শেষপর্যন্ত মানুষের ওপরই চরম সংকট নেমে আসবে।

ছোট্ট জীবজগৎ

প্রকৃতিতে প্রতিটি উদ্ভিদ এবং প্রাণী যেমন পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল তেমনি সমগ্র জীবজগৎ পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল — এই ব্যাপারটা বুঝতে গেলে বানিয়ে ফেলতে হবে তোমার ছোট্ট জীবজগৎ। একটা বড়ো কাচের বা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ঢাকনা সমেত পাত্র নাও। আর ছোটো নুড়ি-পাথর, শামুক বা ঝিনুক, শ্যাওলা, ঝাঁঝি, কচুরিপানা, ছোটো মাছ, ব্যাঙাচি হলেই হবে। প্রথমে পাত্রের তলায় নুড়িপাথর রেখে দাও। শামুক বা ঝিনুক রেখে দিয়ে পাত্রটা জল দিয়ে ভরতি করো। এবার ধীরে ধীরে মাছ আর ব্যাঙাচি ছেড়ে দিলে, মোটামুটি কাজ শেষ। পাত্রটাকে জানালার কাছাকাছি রাখতে হবে। মাঝেমাঝে মাছের খাবার দিতে বা ময়লা জল পালটে দিতে ভুলো না। একসপ্তাহ পর পর ভালো করে লক্ষ করো আর কী কী পরিবর্তন হচ্ছে — সবকিছু গুছিয়ে নোটবুকে লিখে রাখো।

বরফে ঢাকা মহাদেশ

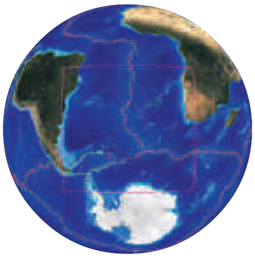

পৃথিবীর মানচিত্রে একেবারে দক্ষিণে সাদা রং-এর অঞ্চলটা কী বলোতো ?—ওটা একটা মহাদেশ।

- ১৮২০ সালে প্রথম জানা যায়—পৃথিবীর দক্ষিণ মেরুতে বা কুমেরুতে রয়েছে বরফে ঢাকা একটা বিশাল ভূখণ্ড।
- একসময় আন্টার্কটিকা , আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ভারত একসাথে প্যানজিয়ার অংশ ছিল। প্রায় ২০ কোটি বছর আগে মহাদেশ সঞ্চরণের ফলে প্যানজিয়া ভেঙে আন্টার্কটিকা দক্ষিণ মেরুতে চলে আসে।

➢ গ্রিক শব্দ '**Antarktika**' র অর্থ '**উত্তরের বিপরীত**'। দক্ষিণ মেরুবিন্দু থেকে ৬০° দক্ষিণ অক্ষরেখার মধ্যে প্রায় গোলাকার এই মহাদেশটাকে কুমেরু বৃত্তরেখা এবং কুমেরু মহাসাগর ঘিরে রেখেছে। আয়তনে পৃথিবীর পঞ্চম এই মহাদেশ (১ কোটি ৪০ লক্ষ বর্গ কিমি) ইউরোপ, ওশিয়ানিয়ার থেকে বড়ো। পৃথিবীর উচ্চতম, শীতলতম, শুষ্কতম, দুর্গম মহাদেশ আন্টার্কটিকা। ক্যাপ্টেন স্কট্, শ্যাকলটন্, আমুন্ডসেন এই মহাদেশের এক একটা অঞ্চল খুঁজে পান। সারাবছরই ১-২ কিমি পুরু স্থায়ী বরফের চাদরে ঢাকা থাকে—এই কারণে পৃথিবীর মানচিত্রে আন্টার্কটিকাকে সাদা রং-এ দেখানো থাকে। তাই আন্টার্কটিকার আরেক নাম **'সাদা মহাদেশ'**।

'আন্টার্কটিকা'—বরফের রাজ্য

➢ পুরো মহাদেশটাই একটা বিশাল উঁচু মালভূমি, যার উচ্চতা ২০০০ থেকে ৫০০০ মিটার। মহাদেশের পশ্চিমদিকের অংশটা সংকীর্ণ কিন্তু পূর্বদিকের অংশটা প্রশস্ত। বহু সাগর, উপসাগর, দ্বীপপুঞ্জ মহাদেশটাকে ঘিরে রেখেছে। প্রশান্ত মহাসাগরের রস উপসাগরের তীরে 'মাউন্ট এরেবাস' আন্টার্কটিকার জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। 'ভিনসন ম্যাসিফ' (৪৮৯২ মি.) আন্টার্কটিকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। বিশাল বিশাল হিমবাহ রয়েছে এই মহাদেশে—এদের মধ্যে 'ল্যাম্বার্ট হিমবাহ' পৃথিবীর দীর্ঘতম।

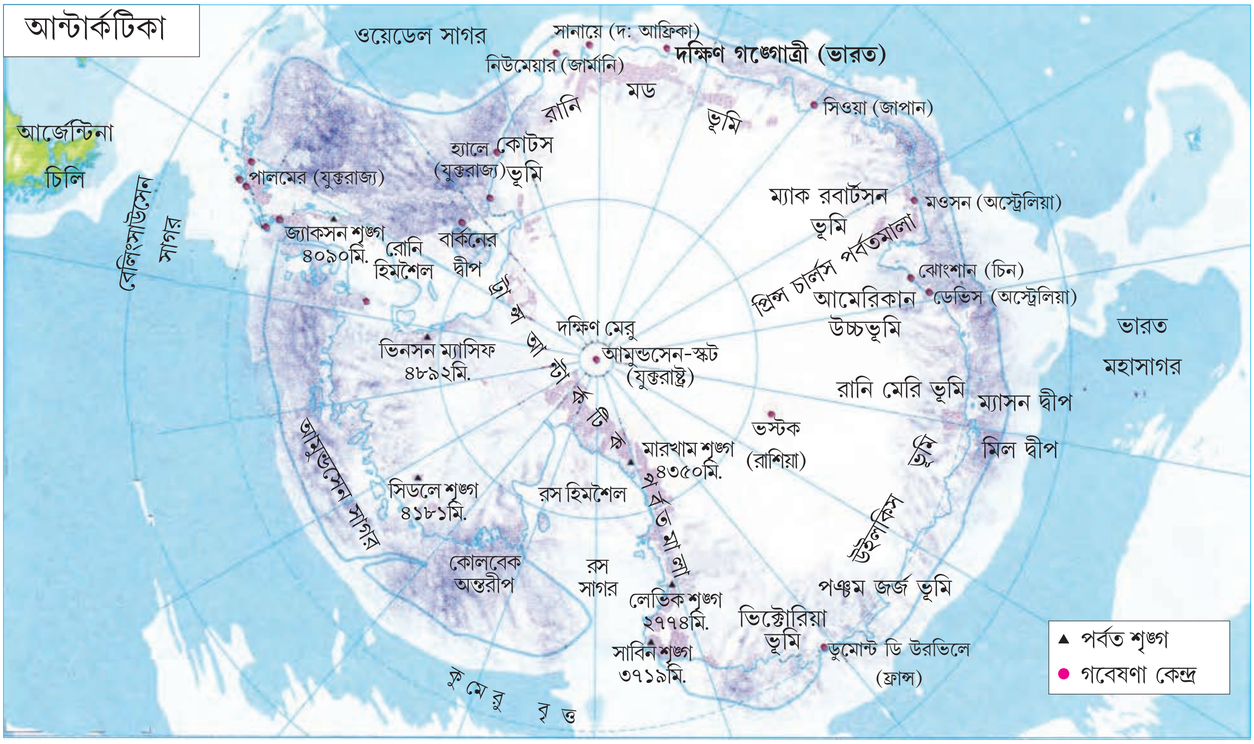

'আমাদের অভিযান'

আমরা যদি রস সাগরের তীর থেকে দক্ষিণ মেরু বিন্দু পর্যন্ত অভিযানের কল্পনা করি ...

মাউন্ট এরেবাসের উত্তপ্ত বাষ্প আর লাভা পেরিয়ে প্রথমেই পড়বে ৩,৫০০ কিমি দীর্ঘ ট্রান্স আন্টার্কটিকা পর্বতশ্রেণি। এরপর বরফহীন উপত্যকা। প্রবল বাতাসের (প্রায় ৩২০ কিমি / প্রতি ঘণ্টা) ধাক্কায় পর্বতের গায়ে বড়ো বড়ো পাথরে ক্ষয় হয়েছে। এর কিছু পরেই বার্ডমোর হিমবাহ। চারিদিকে বহুতল বাড়ির সমান উঁচু বরফের স্তূপ। এখান থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত চিরতুষার ক্ষেত্র, অন্তহীন বরফের রাজত্ব।

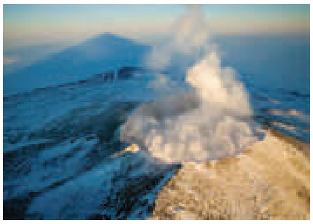
মাউন্ট এরেবাস

বরফহীন উপত্যকা

বার্ডমোর হিমবাহ

বরফের স্তূপ

➤ চিরস্থায়ী বরফে ঢাকা এই মহাদেশ পৃথিবীর শীতলতম অঞ্চল। সারাবছরই হিমশীতল আবহাওয়া, কনকনে ঠান্ডা বাতাস আর তুষারঝড় চলে। শীতকালে তাপমাত্রা –৪০° সে. থেকে –৭৫° সে. পর্যন্ত নেমে যায়। রাশিয়ার গবেষণাকেন্দ্র 'ভস্টক'-এর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা –৮৯.২° সে। এটাই পৃথিবীর শীতলতম (জনবসতিহীন) স্থান। মে—আগস্ট মাসে ২৪ঘণ্টাই অন্ধকার থাকে। আকাশে সূর্য দেখা যায় না। এই সময় মাঝে মাঝেই আকাশ জুড়ে সবুজ, নীল, লাল, রামধনুর রংয়ের মতো আলোর ছটা (মেরুজ্যোতি) দেখা যায়।

মেরুজ্যোতি

গ্রীষ্মকালে (নভেম্বর—ফেব্রুয়ারি মাসে) অবস্থা কিছুটা বদলায়। তাপমাত্রা কিছুটা বেড়ে –২০° সে. এ পৌঁছায়। আকাশে ২৪ ঘণ্টাই সূর্য দেখা যায়। কিন্তু সূর্যের আলো বেশ বাঁকাভাবে পড়ে। তার বেশিরভাগটাই বরফে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যায়। ফলে উষ্ণতা খুব বেশি বাড়তে পারে না।

আন্টার্কটিকার জীবজগৎ

চিরতুষারে ঢাকা আন্টার্কটিকায় কোনো গাছপালা নেই। একমাত্র গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের ধারে কোথাও সামান্য বরফ গলে গেলে মস, লাইকেন, শ্যাওলা জন্মায়। আন্টার্কটিকার একমাত্র স্থায়ী বাসিন্দা পেঙ্গুইন পাখি। ভয়ংকর ঠান্ডাতেই এরা অভ্যস্ত। চারপাশের সমুদ্রে প্রচুর মাছ, সামুদ্রিক পাখি, তিমি, সীল দেখা যায়। আন্টার্কটিকার সমুদ্র চিংড়ি জাতীয় 'ক্রিল'-এ ভর্তি। মাছ, ক্রিল হলো পেঙ্গুইনের প্রধান খাদ্য।

- পেঙ্গুইন উড়তে পারে না। কিন্তু ভালো সাঁতার কাটতে পারে। প্রায় সতেরো রকম প্রজাতির পেঙ্গুইন আছে আন্টার্কটিকায়। এদের মধ্যে এম্পেরর পেঙ্গুইন সবথেকে বড়ো হয়। প্রায় ৪ ফুট লম্বা আর ওজন হয় প্রায় ৩০ কেজি। সারা শরীর চকচকে পালকে ঢাকা থাকে যা জলে ভেজে না। ঠান্ডা থেকে বাঁচতে ত্বকের নীচে পুরু চর্বির স্তর থাকে।

সীল

অ্যালবাট্রস

ক্রিল

তিমি

দক্ষিণ মেরু অভিযান

➤ দিনটা ছিল ১৯ অক্টোবর, ১৯১১ সাল। নরওয়ের অভিযাত্রী রোয়াল্ড আমুন্ডসেন ও তাঁর সঙ্গীরা বেসক্যাম্প থেকে যাত্রা শুরু করলেন। লক্ষ্য আন্টার্কটিকা মহাদেশের কেন্দ্রবিন্দু, কুমেরু বিন্দুতে (৯০° দঃ) পৌঁছানো। ভয়ংকর প্রতিকূল আবহাওয়া, তুষারঝড়, বরফের স্তরে বড়ো বড়ো ফাটল- সব কিছুকে উপেক্ষা করে ১৪ ডিসেম্বর ১৯১১ তাঁরাই প্রথম পৌঁছালেন পৃথিবীর দক্ষিণ মেরুতে।

রোয়াল্ড আমুন্ডসেন

জানতে হবে

- কে সুমেরু বিন্দুতে প্রথম পৌঁছেছিলেন?
- কেমন ছিল সেই অভিযান?
- দক্ষিণ মেরুতে যেমন বরফ ঢাকা একটা মহাদেশ আছে, সুমেরুতে কী আছে?

'আন্টার্কটিকা : বিজ্ঞানের মহাদেশ'

এই মহাদেশ কোনো দেশের অধীন নয়। 'আন্টার্কটিকা' পৃথিবীর সমস্ত দেশের একটা 'আন্তর্জাতিক ভূখণ্ড।' আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, নরওয়ে, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, আর্জেন্টিনা, ভারত সহ প্রায় ৪০ টা দেশের ১০০ টারও বেশি গবেষণাকেন্দ্র রয়েছে এই মহাদেশে।

- সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা এই মহাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ, আবহাওয়া, জলবায়ু, খনিজ সম্পদ প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা করছেন।
- এই মহাদেশের ভূগর্ভে কয়লা, খনিজতেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, তামা, নিকেল, সোনার অফুরন্ত ভাণ্ডার রয়েছে।
- ১৯৫৯ সালের আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুসারে পৃথিবীর যে কোনো দেশ এই মহাদেশে সমস্তরকম বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুযোগ পাবে। কিন্তু সবরকম গবেষণা, পরিকল্পনা হতে হবে শান্তির উদ্দেশ্যে। আন্টার্কটিকার প্রাকৃতিক সম্পদে কোনো দেশের নিজস্ব অধিকার থাকবে না। পৃথিবীর সব দেশকেই এই অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে রক্ষা করতে হবে।

আন্টার্কটিকায় ভারতের অভিযান

- ৯ জানুয়ারি, ১৯৮২ সালে, প্রথম ভারতীয় অভিযাত্রী দল আন্টার্কটিকায় পৌঁছায়। স্থাপিত হয় ভারতের প্রথম গবেষণাকেন্দ্র 'দক্ষিণ গঙ্গোত্রী'।
- ১৯৮৮ সালের ২৬ মার্চ অষ্টম অভিযাত্রী দল 'দক্ষিণ গঙ্গোত্রী' থেকে ৭০কিমি দূরে 'মৈত্রী' নামে আরো একটি গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করে।

মৈত্রী

আন্টার্কটিকার ভবিষ্যৎ

দক্ষিণ মেরুতে চিরতুষারে ঢাকা এই মহাদেশের আবহাওয়া, প্রাকৃতিক পরিবেশ সারা পৃথিবীর জলবায়ুর ভারসাম্য রক্ষা করে। তাই এই মহাদেশের ভবিষ্যৎ আসলে সারা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ।

কিন্তু বিশ্ব উষ্ণায়ন, ওজোন স্তর ক্ষয়, বায়ুদূষণ ইত্যাদি কারণে আন্টার্কটিকার দূষণমুক্ত বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক পরিবেশ, মেঘমুক্ত স্বচ্ছ আকাশ, নির্মল বাতাস—সবকিছুই এখন চরম সংকটে। ক্রমাগত উষ্ণতা বাড়ার ফলে প্রতিদিন একটু একটু করে গলে যাচ্ছে আন্টার্কটিকার বরফ, কমে যাচ্ছে মহাদেশটার আয়তন। ফলে ক্রিল, সিল, পেঙ্গুইন সবারই সংখ্যা কমছে, নষ্ট হচ্ছে আন্টার্কটিকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য।

জানতে হবে —

আন্টার্কটিকার পুরু বরফের স্তর গলে গেলে সমুদ্রের জলস্তর অনেকটা বেড়ে যাবে।

- এর ফলে সারা পৃথিবী জুড়ে কী কী সংকট দেখা দিতে পারে বলে তোমার মনে হয়?
- পৃথিবীর সুমেরু বা উত্তরমেরু অঞ্চলেও কি জমাট বরফের স্তর আছে? সেই বরফও কি গলছে?

- আন্টার্কটিকার বাসিন্দা যেমন পেঙ্গুইন, তেমনই উত্তরমেরু অঞ্চলের বাসিন্দা মেরু ভালুক।
  বিশ্ব উষ্ণায়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রসঙ্গে এই দুজনের মধ্যে একটা কাল্পনিক কথোপকথন ভেবে নিয়ে লিখে ফেলো।

মগজাস্ত্র

- আন্টার্কটিকা এত ঠান্ডা কেন?
- এই মহাদেশে বৃষ্টি হয় না কেন?
- আন্টার্কটিকায় কোনো বড়ো গাছপালা জন্মায় না কেন?
- গ্রীষ্মকালে আন্টার্কটিকা সবথেকে বেশি সূর্যকিরণ পায়। এমনকি নিরক্ষীয় অঞ্চলের থেকেও তা পরিমাণে বেশি। বলোতো কেন? তা সত্ত্বেও গ্রীষ্মকালে, মহাদেশটার উষ্ণতা খুব বেশি বাড়ে না কেন?
- লক্ষ করে দেখো আন্টার্কটিকায় ভারতের প্রথম অভিযান হয়েছিল জানুয়ারি মাসে। তখন ভারতে শীতকাল। শীতকালেই কেন আন্টার্কটিকায় অভিযান হয়?

৭ আবহাওয়া ও জলবায়ু

● রফিক সকাল ন'টায় যখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, আকাশ ছিল রোদ ঝলমলে। ঘড়িতে তখন তিনটে, আকাশ মেঘলা করে এল। চারটের সময় সে যখন বাড়ি ফিরছে ঝোড়ো হাওয়ার সাথে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে।

গত তিন দিন আবহাওয়া কেমন ছিল একটু ভেবে নিয়ে লিখে ফেলো

আবহাওয়ার অবস্থা	প্রথম দিন	দ্বিতীয় দিন	তৃতীয় দিন
গরম—বেশি/মাঝারি/কম			
ঠান্ডা—বেশি/মাঝারি/কম			
আকাশ—মেঘলা/পরিষ্কার			
বৃষ্টি—বেশি/কম/হয়নি			

'গরম, ঠান্ডা, মেঘলা, বৃষ্টি, রোদ ঝলমলে' — শব্দগুলো আমাদের চারপাশের বায়ুমণ্ডলের একটা বিশেষ অবস্থাকে বোঝায়।

আবহাওয়া বলতে কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানের নির্দিষ্ট সময়ের বায়ুর উষ্ণতা, বায়ুর আর্দ্রতা, বায়ুচাপ, বায়ুপ্রবাহ, মেঘাচ্ছন্নতা -এর অবস্থাকে বোঝায়। দিনের বিভিন্ন সময়ে আবহাওয়া বদলাতে পারে। আবার কখনও অল্প সময়ের মধ্যেও আবহাওয়া বদলে যেতে পারে।

বাড়ি ফিরতেই মা জানাল গরমের ছুটিতে এবার পিসির বাড়ি—কালিম্পং-এ যাওয়া হচ্ছে। পিপলুর খুব আনন্দ। মা বললেন, পিসি বলেছেন গরম জামা-কাপড় আনতে। কালিম্পং-এ প্রায় সারাবছর ধরেই ঠান্ডা থাকে।

• কোনো জায়গায় সারাবছর ধরে ঠান্ডা থাকে কেন?

কোনো এক জায়গায় বায়ুমণ্ডলের একদিনের অবস্থা (বিশেষত উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাত) দৈনিক আবহাওয়াকে বোঝায়। তেমনি সেই জায়গার আবহাওয়ার হিসেব রাখলে পরপর সাতদিনের বা এক সপ্তাহের আবহাওয়া সম্বন্ধে জানা যায়। আবার সপ্তাহের আবহাওয়া থেকে ৩০ দিন বা একমাস এবং ১২ মাসের আবহাওয়ার তথ্য থেকে ওই জায়গার সারা বছরের আবহাওয়া সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা পাওয়া যায়।

স্টেশন : কলকাতা

	জা	ফে	মা	এ	মে	জু	জু	আ	সে	অ	ন	ডি	বার্ষিক গড়
উষ্ণতা (° সে.)	১৮	২২	২৭	৩২	৩৫	৩১	৩০	২৯	২৮	২৭	২৪	২০	?
বৃষ্টিপাত (মিমি.)	১১	৩০	৩৫	৬০	১৪২	২৯০	৪১০	৩৫০	২৮০	১৪০	২৬	১৫	?

এপ্রিল-মে মাসে আমাদের রাজ্যে কোন ঋতু দেখা যায় বলোতো?

● লক্ষ করে দেখো আমাদের রাজ্যে ১২ মাসের মধ্যে প্রায় ৭ থেকে ৮ মাসই উষ্ণ থাকে। আর এই ৮ মাসের মধ্যে ৩ থেকে ৪ মাস বৃষ্টি হয়। সাধারণভাবে বলা যায় পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র ধরনের। আমাদের দেশের এই বিশেষ ধরনের উষ্ণ- আর্দ্র জলবায়ু হলো ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু।

কোনো অঞ্চলের প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থা হলো ওই অঞ্চলের জলবায়ু। কোনো অঞ্চলের জলবায়ু বছরের পর বছর প্রায় একইরকম থাকে। যেমন পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু ক্রান্তীয় মৌসুমি প্রকৃতির।

আবহাওয়া ও জলবায়ুর পার্থক্য

আবহাওয়া	জলবায়ু
১) আবহাওয়া কোনো নির্দিষ্ট স্থানের নির্দিষ্ট সময়ের বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উপাদানের অবস্থা।	১) জলবায়ু হলো কোনো অঞ্চলের ৩০-৩৫ বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থা।
২) আবহাওয়া প্রতিদিন এমন কী প্রতি মুহূর্তে বদলায়।	২) জলবায়ু প্রতিদিন বদলায় না।
৩) আবহাওয়া স্বল্প পরিসরে পরিবর্তিত হয়।	৩) জলবায়ু বিস্তৃত অঞ্চলভেদে পরিবর্তিত হয়।

আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রধান উপাদান—

বায়ুর উষ্ণতা

সূর্যরশ্মির ২০০ কোটি ভাগের ১ ভাগ মাত্র পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। একে বলা হয় ‘Insolation’ (Incoming Solar Radiation) বা ‘আগত সৌর বিকিরণ’। আগত সৌর বিকিরণকে ১০০ শতাংশ ধরলে, তার মাত্র ৫১ শতাংশ ভূ-পৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে। তাই একে বলে ‘কার্যকরী সৌর বিকিরণ’। বাকি ৪৯ শতাংশের মধ্যে ৩৫ শতাংশ মহাশূন্যে ফিরে যায়। একে বলে ‘অ্যালবেডো’। বাকি ১৪ শতাংশ বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন গ্যাস, জলীয়বাষ্প, ধূলিকণা দ্বারা শোষিত হয়। যে ৫১ শতাংশ তাপ পৃথিবী পৃষ্ঠে এসে পৌঁছায়, তার প্রায় পুরোটাই রাতের বেলা বিকিরিত হয়ে মহাশূন্যে ফিরে যায়। একে ‘পার্থিব বিকিরণ’ (পৃথিবী থেকে ফিরে যাওয়া তাপ) বলে । বায়ুমণ্ডল সরাসরি সূর্যরশ্মি দ্বারা উত্তপ্ত হয় না।

পৃথিবীর আবহাওয়াকে প্রধানত সূর্যরশ্মি নিয়ন্ত্রণ করে।

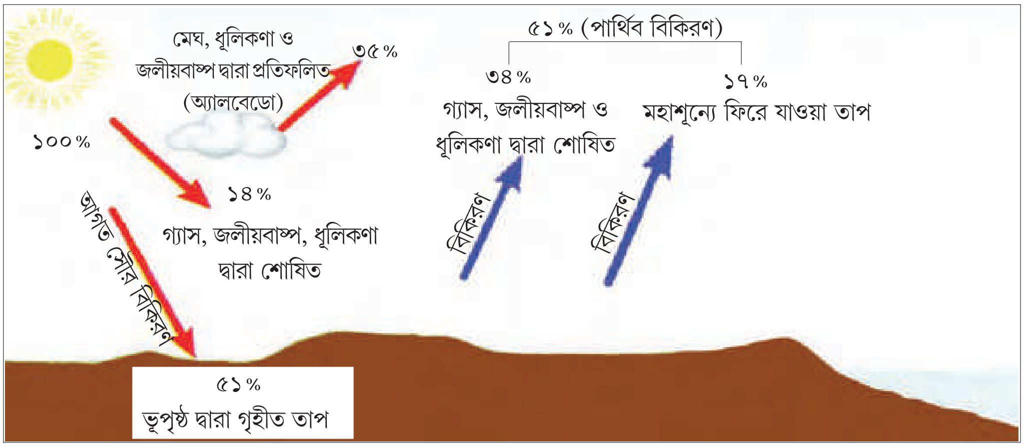

আমাদের চারপাশের বায়ুমণ্ডল কতরকমভাবে উত্তপ্ত হয় ?

- শীতকালে আগুন জ্বালিয়ে আগুনের চারপাশে বসে কয়েকজন মানুষ গা গরম করছে—আগুন থেকে বিকিরিত তাপ সরাসরি মানুষের দেহকে উত্তপ্ত করছে। এভাবেই সূর্য থেকে আসা তাপ সরাসরি ভূপৃষ্ঠ ও ভূপৃষ্ঠের গাছপালা সবকিছুকেই উত্তপ্ত করে। এই তাপ আবার ভূপৃষ্ঠ থেকে বায়ুমণ্ডলে বিকিরিত হয়। এই পদ্ধতি হলো বিকিরণ।

- মোমবাতির ওপর একটা স্টিলের চামচ কিছুক্ষণ ধরে রাখলে প্রথমে গোলাকার ও পরে দণ্ডাকার অংশটা গরম হয়ে ওঠে। তাপ চামচের গোলাকার অংশ থেকে দণ্ডাকার অংশ ও আঙুলে পরিবাহিত হয়। ফলে আঙুলে ছ্যাঁকা লাগে। তাপের এইভাবে পরিবাহিত হওয়ার পদ্ধতি হলো পরিবহণ।

একইভাবে প্রথমে সূর্যের তাপে উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠের সাথে লেগে থাকা নীচের বায়ুস্তর উত্তপ্ত হয়। এই উত্তাপ তার ঠিক উপরের লাগোয়া বায়ুস্তরে পরিবাহিত হয়।

> তাপ (Heat) হলো শক্তি, যা কোনো বস্তুকে উত্তপ্ত করে। তাপমাত্রা বা উষ্ণতা (Temperature) হলো তাপের পরিমাপ।

• একটা পাত্রে খানিকটা জল নিয়ে গ্যাস বা উনুনে বসালে কিছুক্ষণ পর জলটা গরম হয়ে উঠবে। কীভাবে জলটা গরম হয় বলোতো? আগুনের তাপে পাত্রের নীচের জল প্রথমে গরম ও হালকা হয়ে ওপরের দিকে ওঠে আর ওপরের ঠান্ডা জল নীচের দিকে নামে। আবার সেই জল গরম হয়ে ওপরের দিকে ওঠে। এইভাবে তাপ সঞ্চালনের মাধ্যমে পুরো পাত্রের জল গরম হয়ে ওঠে।

ঠিক তেমনি সূর্য থেকে আসা তাপে পৃথিবী পৃষ্ঠের গায়ে লেগে থাকা সবচেয়ে নীচের বায়ুস্তর প্রথমে উত্তপ্ত হয়। এই উষ্ণ বায়ু হালকা হয়ে ওপরে ওঠে আর ওপরের শীতল বায়ু নীচে নামে। এই শীতল বায়ু পর্যায়ক্রমে গরম হয়ে ওপরের দিকে উঠে যায়। এইভাবে বায়ুর পরিচলন স্রোতের মাধ্যমে বিস্তীর্ণ এলাকার বায়ুমন্ডল উত্তপ্ত হয়। এই পদ্ধতি হলো পরিচলন।

দিন ও রাতের তাপমাত্রার পার্থক্য

কোনো স্থানের এক দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পার্থক্য হলো সেই স্থানের দৈনিক উষ্ণতার প্রসর বা পার্থক্য (Diurnal range of temperature)। আবার কোনো স্থানের শীতলতম ও উষ্ণতম মাসের তাপমাত্রার পার্থক্য হলো গড় বার্ষিক উষ্ণতার প্রসর (Mean annual range of temperature)। দৈনিক উষ্ণতার প্রসর বেশি হলে, দিনের বেলা ভীষণ গরম আর রাতের বেলা প্রচণ্ড ঠান্ডা হয়। আবার বার্ষিক উষ্ণতার প্রসর বেশি হলে গরমের সময় ভীষণ গরম, শীতের সময় প্রবল ঠান্ডা হয়।

- জ্বর হলে যেমন থার্মোমিটার দিয়ে দেহের উত্তাপ মাপা হয় ঠিক তেমনি বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা মাপার জন্যও থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয়।
- টিভি, সংবাদপত্রে আবহাওয়ার খবরে 'দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা'— কথাটা বলা বা লেখা হয়।
- সিক্স-এর থার্মোমিটার দিয়ে কোনো দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়।

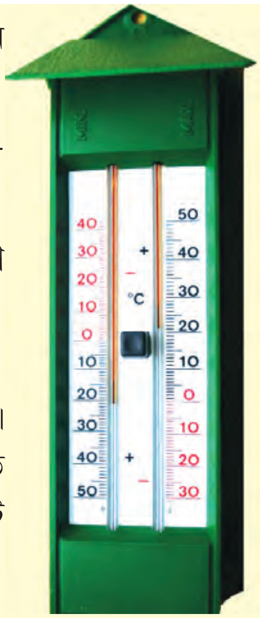

সিক্স-এর থার্মোমিটার

জানো কি?

তাপমাত্রা মাপার দু-রকম স্কেল আছে। ফারেনহাইট আর সেলসিয়াস বা সেন্টিগ্রেড। ফারেনহাইট স্কেলে ৩২°F বা সেন্টিগ্রেড স্কেলে ০°C এ জল জমে বরফে পরিণত হয়। আর ফারেনহাইট স্কেলে ২১২°F বা সেন্টিগ্রেড স্কেলে ১০০°C এ জল ফুটে বাষ্পে পরিণত হয়।

জ্বর হলে সাধারণত থার্মোমিটারের কোন স্কেলে তাপমাত্রা মাপা হয়?

বায়ুর আর্দ্রতা

বর্ষাকালে সারাক্ষণ 'ভেজা ভেজা' ভাব থাকে। জামা-কাপড় শুকনো হতে চায় না। এই 'ভেজা ভেজা' ভাব কেন হয় জানো? কারণ এই সময় বায়ুতে অনেক বেশি পরিমাণ জলীয়বাষ্প থাকে। শীতকালে বায়ুতে জলীয়বাষ্প কম থাকে বলে জামাকাপড় তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় এবং আমাদের চামড়াতেও টান ধরে।

নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ুতে যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প থাকে, সেটাই ওই বায়ুর আর্দ্রতা (Humidity)।

বায়ুর আর্দ্রতা মাপা হয় হাইগ্রোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে।

বায়ুচাপ ও বায়ুপ্রবাহ

- দুটো মোটা বই এক হাতের চেটোর ওপর রাখলে বেশ ভারী লাগবে। কারণ বই দুটোর ওজন তোমার হাতের ওপর চাপ দিচ্ছে।

তেমনি বায়ুর ওজন আছে। বায়ু পৃথিবীর ওপর চাপ দেয়। সমুদ্র-পৃষ্ঠে বায়ুর চাপ সবথেকে বেশি। যত ওপরে ওঠা যায় বায়ুর চাপ তত কমতে থাকে। বায়ুচাপ কমে গিয়ে নিম্নচাপ হলে ঝড়-বৃষ্টি, অশান্ত আবহাওয়া তৈরি হয়। আবার, বায়ুচাপ বেড়ে গিয়ে উচ্চচাপ হলে পরিষ্কার আকাশ, শান্ত আবহাওয়া দেখা যায়। বলোতো শীতকালে বায়ুচাপ কেমন হয়?

বায়ুর চাপ মাপার যন্ত্রের নাম **ফোর্টিন ব্যারোমিটার**।

- জানালার বাইরে তাকাতেই তিন্নি দেখল গাছের শুকনো পাতাগুলো উড়ে যাচ্ছে আর ঝিরিঝিরি হাওয়া বইছে।

ভূপৃষ্ঠের সমান্তরালে বায়ুর প্রবাহ হলো 'বায়ুপ্রবাহ'।

- বায়ু সব জায়গায় চাপ সমান রাখার জন্য উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। হঠাৎ কোনো জায়গায় বাতাসের চাপ খুব কমে গেলে, বাতাস ভীষণ গতিতে আশেপাশের উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে ছুটে আসে। তখন ঝড় ওঠে।

বাতাসের গতি বেশি হলে গাছপালা, ঘর-বাড়ি ভেঙে পড়ে, অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। নদীতে বা সমুদ্রে মাছ ধরার ক্ষেত্রে সতর্কতা জারি হয়।

- পড়তে পড়তে বইয়ের পাতাটা হঠাৎ দমকা হাওয়ায় উলটে গেল। বুকাই উঠে গিয়ে দক্ষিণের জানালার কাছে দাঁড়াল। খুব সুন্দর 'দখিনা বাতাস' বইছে। বায়ু যে দিক থেকে প্রবাহিত হয় সেই দিক অনুসারে বায়ুর নাম দেওয়া হয়।

বলোতো শীতের সকালে কোন দিকের জানালাটা বন্ধ করে রাখতে ইচ্ছে করে? (উত্তর/দক্ষিণ/পূর্ব/পশ্চিম)

বায়ুপ্রবাহের দিক মাপা হয় 'বাতপতাকা' দিয়ে। আর বায়ুর গতিবেগ মাপা হয় 'অ্যানিমোমিটার' যন্ত্র দিয়ে।

মেঘাচ্ছন্নতা ও বৃষ্টিপাত

- বুধবার সকাল থেকেই আকাশটা মেঘলা ছিল। রাতে গুমোট গরমে সুজয়ের ভালো ঘুম হলো না।
  কেন মেঘলা রাতে গরম পড়ে?

মেঘলা আকাশ পৃথিবীকে একটা চাদরের মতো ঢেকে রাখে। দিনের বেলা যে তাপ পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়, আকাশ মেঘলা থাকলে সেই পরিমাণ তাপ রাতের বেলায় বায়ুমণ্ডল থেকে বেরিয়ে যেতে পারে না। ফলে রাতে তাপমাত্রা বেড়ে যায়, গরম বেশি লাগে।

- একটু ভেবে বলো—দিনের বেলা আকাশ মেঘলা থাকলে দিনের তাপমাত্রা বেড়ে যাবে না কম হবে? শীতকালে আকাশে মেঘ না থাকলে রাতে ঠান্ডা বেশি পড়বে না কম?

আকাশে মেঘের পরিমাণের পরিমাপই হলো মেঘাচ্ছন্নতা (Cloud Cover)।

পরিষ্কার আকাশ

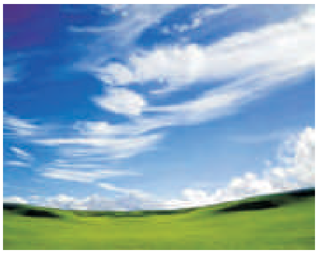

আংশিক মেঘলা আকাশ

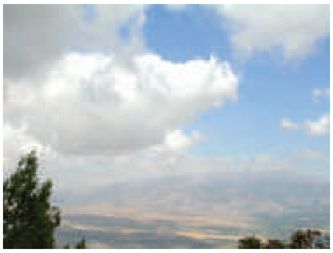

প্রায় মেঘলা আকাশ

সম্পূর্ণ মেঘলা আকাশ

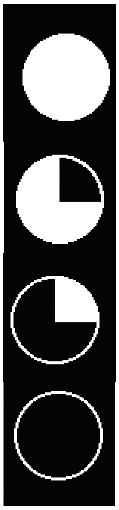

০% মেঘাচ্ছন্নতা— পরিষ্কার আকাশ

২৫% মেঘাচ্ছন্নতা— আংশিক মেঘলা আকাশ

৭৫% মেঘাচ্ছন্নতা— প্রায় মেঘলা আকাশ

১০০% মেঘাচ্ছন্নতা— সম্পূর্ণ মেঘলা আকাশ

- সকাল থেকেই বেশ জোরে বৃষ্টি পড়ছিল। জানালা দিয়ে হালকা হালকা বৃষ্টির জল ঘরে ঢুকছিল। জানালাটা বন্ধ করতে গিয়ে হঠাৎ রেহানার মনে হলো— বৃষ্টি কীভাবে হয়?

জলীয়বাষ্পযুক্ত বাতাস হালকা বলে ওপরের দিকে উঠে যায়। ওপরের বায়ুর উষ্ণতা ও চাপ—দুইই কম থাকায় জলীয় বাষ্প ঠান্ডা হয়ে ছোটো ছোটো জলকণায় পরিণত হয়। একে ঘনীভবন বলে। এই জলকণা বায়ুতে ভেসে থাকা ধূলিকণাকে আশ্রয় করে মেঘ তৈরি করে। ছোটো ছোটো জলকণা পরস্পর মিশে গিয়ে ক্রমশ বড়ো ও ভারী জলকণায় পরিণত হয়। তখন এই জলকণা অভিকর্ষের টানে বৃষ্টিরূপে পৃথিবীর উপর ঝরে পড়ে। যেসব জায়গায় বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা সাধারণত ০°সে.-এর নীচে থাকে, সেখানে তুষারপাত হয়।

বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাপার যন্ত্রের নাম রেনগজ।

বায়ুর উষ্ণতা, আর্দ্রতা, বায়ুচাপ, মেঘাচ্ছন্নতা, অধঃক্ষেপণ—এগুলোই হলো আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান।

শব্দগুলো উলটোপালটা আছে ঠিকঠাক সাজিয়ে লিখে ফেলো।

ক) ৩০ থেকে ৩৫ বছরের গড় আবহাওয়াকে বলে ____________ [ল জ য়ু বা]

খ) বায়ুমণ্ডলের যে অবস্থা দ্রুত বদলে যায় তাকে বলে ______________ [ব আ ও হা য়া]

গ) বৃষ্টিপাত মাপার যন্ত্রের নাম ___________ [জ গ ন রে]

ঘ) সূর্যরশ্মির যে অংশ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত না করে সরাসরি মহাশূন্যে ফিরে যায় তাকে বলে __________ [ল অ্যা ডো বে]

ঙ) আকাশে মেঘের পরিমাণের পরিমাপ হলো ____________ [তা মে ন্ন ঘা চ্ছ]

মিলিয়ে লেখো

আবহাওয়ার উপাদান	পরিমাপের যন্ত্র
বায়ুর চাপ	থার্মোমিটার
বায়ুর উষ্ণতা	অ্যানিমোমিটার
বায়ুর আর্দ্রতা	ব্যারোমিটার
বায়ুর গতিবেগ	হাইগ্রোমিটার

আবহাওয়া সম্পর্কিত বিবৃতির পাশে ‘ ’ চিহ্ন আর জলবায়ু সম্পর্কিত বিবৃতির পাশে ‘ ’ চিহ্ন দাও।

ক) দার্জিলিং-এ প্রায় সারা বছরই ঠান্ডা থাকে।

খ) আগামী ৪৮ ঘণ্টায় সুন্দরবনের ওপর দিয়ে প্রায় ৬০ কিমি বেগে ঝোড়ো বাতাস আসার পূর্বাভাস আছে।

গ) সাহারা মরুভূমিতে বহু বছর ধরেই খুব অল্প বৃষ্টিপাত হয়।

ঘ) গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতায় ২০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে।

ঙ) লাডাখ -এ শীতকালে তাপমাত্রা প্রায়ই -- ৪০° সে. এ নেমে যায়।

● আলোর জেঠু ‘আবহাওয়া অফিসে’ কাজ করেন।

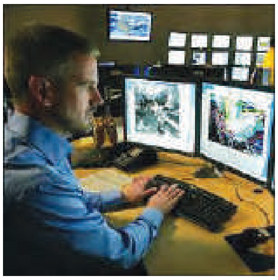

তার মনে হলো খবরের কাগজ, টিভি বা রেডিয়োতে আবহাওয়া সম্বন্ধে যে খবর দেখা বা শোনা যায়—সেগুলো কি ওখান থেকে আসে?

হ্যাঁ, আলোর ভাবনাটা একদম ঠিক। আবহাওয়া অফিসে ২৪ ঘণ্টার আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদান সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে আবহাওয়া মানচিত্র তৈরি করা হয়। এই সব তথ্য টিভি, খবরের কাগজ, রেডিয়ো স্টেশনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

আবহাওয়া অফিস কোনো জায়গার আবহাওয়া কী রকম হবে অর্থাৎ আবহাওয়ার পূর্বাভাস (Weather Forecast) সম্বন্ধে তথ্য জানায়। ‘আগামী ৪৮ ঘণ্টায় সুন্দরবনের উপর দিয়ে ৮০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে, জেলেভাইরা সমুদ্রে মাছ ধরতে যাবেন না।’— রেডিয়ো বা টিভিতে শোনা এই কথাগুলো আবহাওয়ার পূর্বাভাস।

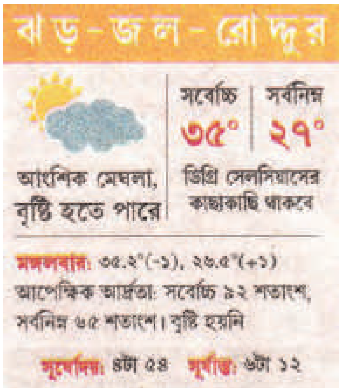

ঝড়-জল-রোদ্দুর

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৫°	২৭°

আংশিক মেঘলা, বৃষ্টি হতে পারে

ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকবে

মঙ্গলবার: ৩৫.২°(-১), ২৬.৫°(+১)
আপেক্ষিক আর্দ্রতা: সর্বোচ্চ ৯২ শতাংশ, সর্বনিম্ন ৬৫ শতাংশ। বৃষ্টি হয়নি

সূর্যোদয়: ৪টা ৫৪ সূর্যাস্ত: ৬টা ১২

খবরের কাগজে প্রকাশিত কোনো একদিনের আবহাওয়ার খবর

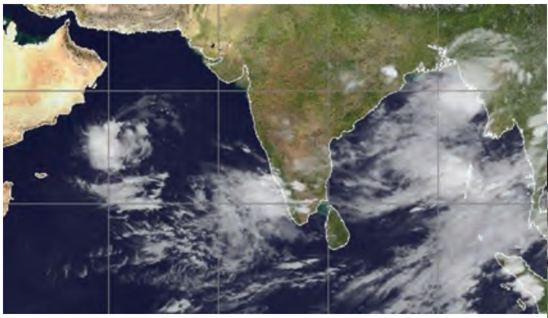

আবহাওয়া সংক্রান্ত উপগ্রহ চিত্র

পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া অফিসের সদর দপ্তর কলকাতার আলিপুরে।

কাছাকাছি কোনো আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র/অফিসে গেলে জানতে পারবে কীভাবে যন্ত্রগুলোর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়, পূর্বাভাস দেওয়া হয়।

ক্লাসের সবাই পাঁচটা দলে ভাগ হয়ে যাও। এবার প্রতিটা দল একটা করে পরিচয় ঠিক করে নাও।

১. কৃষক   ২. ছাত্র   ৩. জেলে   ৪. বিমানচালক   ৫. জাহাজের নাবিক   ‘তোমার জীবনে আবহাওয়ার পূর্বাভাস কীভাবে কতখানি কাজে লাগে’ — এই বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো।

বায়ুর তাপমাত্রা পৃথিবীর সব জায়গায় একরকম হয় না

মাসির বাড়ির ছাদে বসে উজান ভাবছিল, শীতকালে রোদ পোহাতে বেশ আরাম লাগে। কিন্তু গরমে এই রোদে বাড়ির বাইরে যেতে ইচ্ছে করে না। গরম আর শীতের রোদ কি আলাদা?

পৃথিবীর অক্ষ তার কক্ষপথের সাথে ৬৬$\frac{১}{২}$°কোণে হেলে থাকে। গরমকালে ভূপৃষ্ঠের ওপর সূর্যরশ্মি প্রায় সোজা বা লম্বভাবে পড়ে। ফলে উষ্ণতা বেশি হয়। শীতকালে সূর্যরশ্মি ভূপৃষ্ঠের উপর তির্যকভাবে পড়ায় উষ্ণতা কমে যায়। সূর্য থেকে আসা আলো পৃথিবীপৃষ্ঠের সাথে যে কোণ তৈরি করে সেটাই হলো **সূর্যরশ্মির পতনকোণ**। পৃথিবীর যে অংশে সূর্যের তাপ লম্বভাবে পড়ে সেখানে বেশি গরম, আর যেখানে তির্যকভাবে পড়ে সেখানে ততটা গরম হয় না। আবার যেখানে বেশি তির্যকভাবে পড়ে সেখানে সারাবছর খুব ঠান্ডা থাকে।

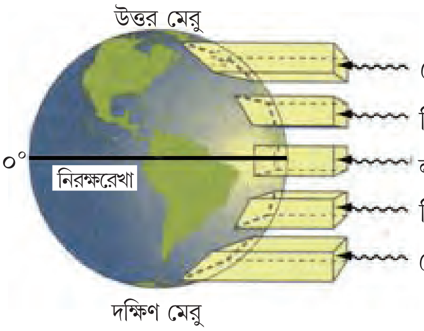

উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে উষ্ণতা হ্রাস

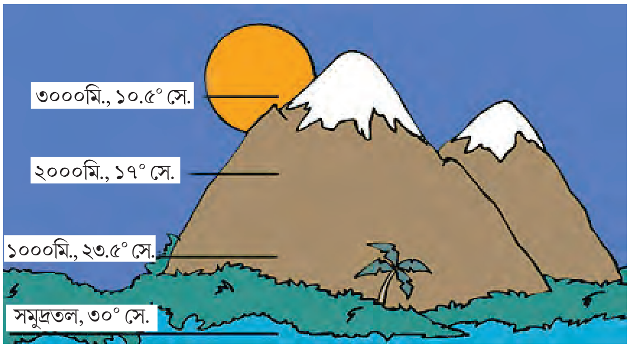

উচ্চতা বৃদ্ধিতে উষ্ণতা হ্রাস

ভূপৃষ্ঠ সূর্যের তাপ শোষণ করে উত্তপ্ত হয়। ভূপৃষ্ঠ থেকে ওপরের দিকে তাপমাত্রা ক্রমশ কমতে থাকে। প্রতি ১৬৫ মি উঁচুতে ১° সেন্টিগ্রেড করে অথবা প্রতি ১০০০ মি উচ্চতায় ৬.৫° সে. হারে তাপমাত্রা কমে যায়। যে স্থান সমুদ্রের যত কাছে অবস্থিত সেখানে তাপমাত্রার প্রসর তত কম হয়। অর্থাৎ জলবায়ু সমভাবাপন্ন প্রকৃতির হয়।

দিল্লী এবং মুম্বই -এই দুই শহরের কোথায় সমভাবাপন্ন আর কোথায় চরমভাবাপন্ন জলবায়ু দেখা যায়?

মগজাস্ত্র!

একই দিনে দুটো আবহাওয়া স্টেশনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন উষ্ণতার তথ্য দেওয়া আছে।

স্টেশন	বার্ষিক সর্বোচ্চ উষ্ণতা	বার্ষিক সর্বনিম্ন উষ্ণতা	গড় উষ্ণতা	উষ্ণতার প্রসর
A	৩৬°সে.	১৪°সে.	?	?
B	২৬°সে.	২৪°সে.	?	?

লক্ষ করে দেখো দুটো স্টেশনের গড় উষ্ণতা সমান। কিন্তু উষ্ণতার প্রসর সমান নয়। কোন স্টেশনটার সমুদ্রের কাছাকাছি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি?

মনে করো তুমি একটা পর্বতশৃঙ্গ অভিযানে যাবে। তুমি যখন যাত্রা শুরু করলে তখন উচ্চতা ২০০০ মিটার আর তাপমাত্রা ১৫°সে.। পর্বতের চূড়ায় (৪০০০ মিটার) তাপমাত্রা কত হবে? (সূত্র — প্রতি ১০০০ মিটার উচ্চতায় তাপমাত্রা ৬.৫°সে. করে কমে যায়।)

সমোষ্ণরেখা

পৃথিবীর মানচিত্রে সমান গড় উষ্ণতাযুক্ত স্থানগুলোকে যে রেখা দ্বারা যুক্ত করা হয় তাকে **সমোষ্ণরেখা** বলে।

- দুটো জায়গার মধ্যে উষ্ণতার পার্থক্য বেশি হলে সমোষ্ণরেখাগুলো কাছাকাছি ও উষ্ণতার পার্থক্য কম হলে সমোষ্ণরেখাগুলো দূরে দূরে অবস্থান করে।
- উত্তর গোলার্ধের চেয়ে দক্ষিণ গোলার্ধে জলভাগ বেশি থাকায় এই গোলার্ধে সমোষ্ণরেখাগুলো দূরে অবস্থান করে।
- সমোষ্ণরেখা কাছাকাছি অবস্থান করলেও কখনো পরস্পরকে ছেদ করে না।

পৃথিবীর তাপমণ্ডল

নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে দুই মেরুর দিকে তাপের পরিমাণ ক্রমশ কমে। কারণ হলো সূর্যরশ্মির পতনকোণের তফাৎ। সূর্যরশ্মির পতনকোণের ভিত্তিতে পৃথিবীকে তিনটি তাপমণ্ডল বা তাপ অঞ্চলে (Heat Zone) ভাগ করা হয়।

(১) উষ্ণমণ্ডল — নিরক্ষরেখার উভয় দিকে কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি রেখার মাঝের অঞ্চল হলো উষ্ণমণ্ডল। সূর্যরশ্মি সারা বছর লম্বভাবে পড়ে। পৃথিবীপৃষ্ঠ সবথেকে বেশি উত্তপ্ত হয়।

(২) নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল — কর্কটক্রান্তি রেখা থেকে সুমেরু বৃত্ত রেখা এবং মকরক্রান্তি রেখা থেকে কুমেরুবৃত্ত রেখার মাঝের অঞ্চল হলো নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল। এখানে সূর্যরশ্মি তির্যকভাবে পড়ায় এই অঞ্চল উষ্ণমণ্ডলের তুলনায় কম উত্তপ্ত হয়।

(৩) হিমমণ্ডল — সুমেরুবৃত্ত থেকে উত্তর মেরু এবং কুমেরু বৃত্ত থেকে দক্ষিণ মেরুর মাঝের অঞ্চল হলো হিমমণ্ডল। সূর্যরশ্মি সারাবছর বেশি তির্যকভাবে পড়ায় এই অঞ্চল সবচেয়ে কম উত্তপ্ত হয়। সারা বছর ধরে বেশ ঠান্ডা থাকে।

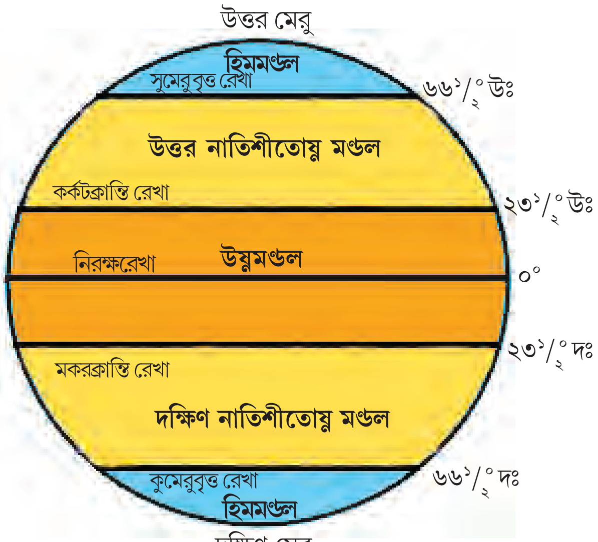

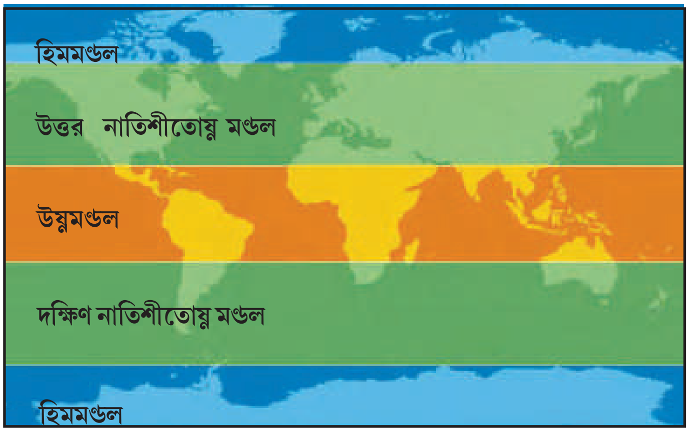

পৃথিবীর মানচিত্রে তাপমণ্ডল

আমাদের জীবনে জলবায়ুর প্রভাব

আমাদের জীবনে জলবায়ুর প্রভাব—এই বিষয়ে নিজের ভাষায় প্রতিবেদন তৈরি করো।

- খুদে আবহবিদরা দুটো আবহাওয়ার রিপোর্ট তৈরি করো। (টিভি, রেডিয়ো বা খবরের কাগজ থেকে উষ্ণতা আর বৃষ্টিপাতের তথ্য পেয়ে যাবে। বাকিগুলো তোমাদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে)।

মে মাস (একটানা সাতদিনের আবহাওয়ার রিপোর্ট)

দিন	সর্বোচ্চ উষ্ণতা	সর্বনিম্ন উষ্ণতা	বৃষ্টিপাত	মেঘাচ্ছন্নতা 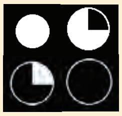	বায়ুপ্রবাহ মাঝারি/জোরে	মোটের ওপর আবহাওয়া
১ম দিন						
২য় দিন						
৩য় দিন						
৪র্থ দিন						
৫ম দিন						
৬ষ্ঠ দিন						
৭ম দিন						

➤ দৈনিক সর্বনিম্ন উষ্ণতা কোনদিন সব থেকে বেশি আর কোনদিন সব থেকে কম ছিল?

➤ প্রত্যেক দিনের গড় উষ্ণতা বের করো।

সেপ্টেম্বর মাস (একটানা সাত দিনের আবহাওয়ার রিপোর্ট)

দিন	সর্বোচ্চ উষ্ণতা	সর্বনিম্ন উষ্ণতা	বৃষ্টিপাত	মেঘাচ্ছন্নতা মাঝারি/জোরে	বায়ুপ্রবাহ	মোটের ওপর আবহাওয়া
১ম দিন						
২য় দিন						
৩য় দিন						
৪র্থ দিন						
৫ম দিন						
৬ষ্ঠ দিন						
৭ম দিন						

➤ দৈনিক সর্বোচ্চ উষ্ণতা কোনদিন সবথেকে বেশি আর কোনদিন সব থেকে কম ছিল?

➤ প্রত্যেক দিনের গড় উষ্ণতা বের করো।

● এবার দুটো রিপোর্ট থেকে দুটো মাসের আবহাওয়ার উপাদানগুলোর কী কী পার্থক্য পেলে নিজের মতো করে খাতায় লেখো।

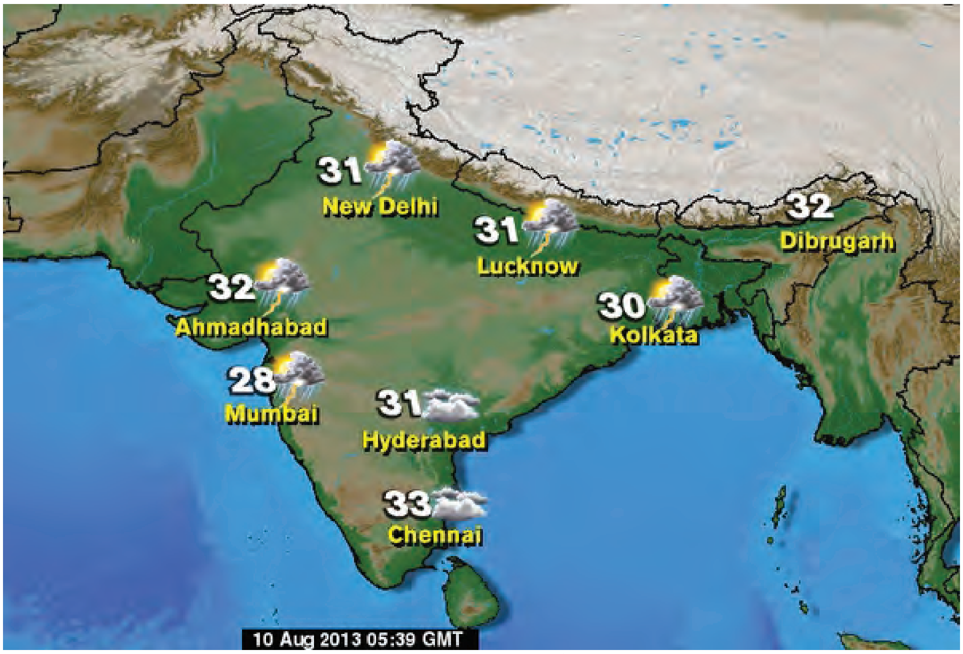

একটি দিনের আবহাওয়ার উপগ্রহ চিত্র

বায়ুদূষণ

দেখোতো বাতাস আর পৃথিবী কী বলছে...

কী ভাই খবর কী ?

উঃ, আমাকে বাঁচাও, আমি তো আর পারছি না।

কেন কী হলো ? বেশ তো আছ আমার সাথে জড়িয়ে ....

আছি তো, কিন্তু তোমার মানুষরাই তো আমায় ভালো থাকতে দিচ্ছে না। দেখছ না, তারা আমার কী হাল করেছে ! এরা কী বোঝে না, আমি অসুস্থ হলে নিজেরাও বাঁচবে না !

সত্যিই তো ভাববার বিষয় ! এর একটা ব্যবস্থা তো করতেই হবে-

হ্যাঁ ভাই, যা করার তাড়াতাড়ি করো। এতে আমিও ভালো থাকব আর তোমরাও।

বিভিন্ন প্রকার বিষাক্ত গ্যাস (যেমন—কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন-অক্সাইড (NOx), সালফার ডাইঅক্সাইড (SO_2) ইত্যাদি), রাসায়নিক পদার্থ (সিসা, ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন), যানবাহনের ধোঁয়া, ধূলিকণা, জৈবপদার্থ বাতাসে মিশলে বাতাস দূষিত হয়।

শ্বাস নিয়ে ফুসফুসে যে বাতাস টেনে নাও, তার থেকে অক্সিজেন রক্তে মিশে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু দূষিত বাতাস শরীরে ঢুকলে কী হবে বলোতো ?

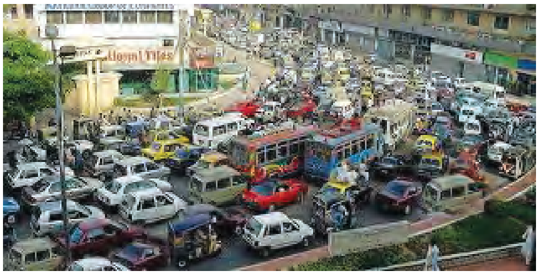

- রুকাই-এর বাড়ি শহরের এক ঘিঞ্জি এলাকায়, বড়ো রাস্তার পাশে। সেখান দিয়ে সবসময় বাস, ট্যাক্সি, লরি, প্রাইভেট গাড়ি যায়। ধুলো ধোঁয়ায় সারাক্ষণ ভরে থাকে এলাকাটা। ঠিকমতো শ্বাস পর্যন্ত নেওয়া যায় না। রুকাইয়ের দাদু প্রায় সারাবছরই হাঁপানিতে ভোগেন।

- সোনাইদের বাড়ির আশেপাশে বেশ কয়েকটা ইটভাটা আর কারখানা আছে। সেগুলোর চিমনি থেকে প্রতিদিন কালো ধোঁয়া বের হয়ে বাতাসে মেশে। ফলে ওদের এলাকার বাতাস কেমন যেন ভারী হয়ে থাকে। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

ওপরের দুটো অবস্থাতেই বাতাস দূষিত হচ্ছে।

বায়ুদূষণের কারণ—

- পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা যত বাড়ছে চাষবাস, ঘরবাড়ি তৈরি করার জন্য তত গাছপালা, বনজঙ্গল কেটে ফেলা হচ্ছে। বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে চলেছে।

- সারা পৃথিবী জুড়ে কলকারখানা, শিল্পকেন্দ্র, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে প্রচুর পরিমাণে কার্বনের গুঁড়ো, ধোঁয়া ও ধূলিকণা, কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড-এর মতো ক্ষতিকারক গ্যাস বাতাসে মিশছে।

- চাষের জমি থেকে রাসায়নিক সার, কীটনাশকের গুঁড়ো, আবর্জনা, খড়কুটো পোড়ানো ছাই, ধূলিকণা প্রভৃতি বাতাসকে দূষিত করছে।

- গাড়ির সংখ্যা দিন দিন যেভাবে বাড়ছে তাতে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা মুশকিল হচ্ছে। বাস, লরি, প্রাইভেট গাড়ি, জাহাজ, এরোপ্লেন — সবেতেই পেট্রোল, ডিজেল, গ্যাসোলিন ইত্যাদি জ্বালানি পোড়ানো হয়। এর ফলে প্রচুর পরিমাণে কার্বন মনোক্সাইড, সিসা বাতাসে মেশে।

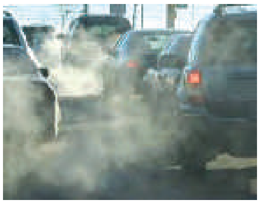

জানো কি?

- যে সমস্ত জৈব ও অজৈব পদার্থ বাতাসকে দূষিত করে সেগুলোই হলো বায়ুদূষক।

আমাদের দেশের পাঁচটা বড়ো শহর - কলকাতা, দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই আর বেঙ্গালুরু-র রাস্তায় প্রতিদিন যে পরিমাণ গাড়ি চলে সেগুলো থেকে প্রায় ১০ লক্ষ কিলোগ্রাম ধোঁয়া বাতাসে মেশে।

বায়ুদূষণ তোমার ঘরেও...

শুধু যে বড়ো শহর, শিল্প-কারখানা, যানবাহন থেকেই বাতাস দূষিত হয় তাই নয় তোমার ঘরের ভিতরের বাতাসও দূষিত হতে পারে!

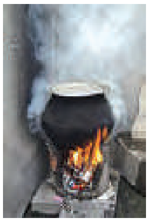

- রান্নার জন্য কাঠ, ঘুঁটে, কয়লা, গ্যাস থেকে প্রচুর ধোঁয়া, কার্বন কণা, বেশ কিছু ক্ষতিকারক গ্যাস ঘরের বাতাসে মেশে।

- ঘরের আবর্জনা, জঞ্জাল, ধূপকাঠির ধোঁয়া, মশা তাড়ানোর ধূপ, তেল, ঘর পরিষ্কার করার বিভিন্নকরম জীবাণুনাশক রাসায়নিক দ্রব্য, দুর্গন্ধ দূর করার সুগন্ধী দ্রব্য থেকেও ঘরের বাতাস দূষিত হয়।

২০১১ সালে জাপানের ফুকুসিমায় পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রে বিস্ফোরণ ঘটে। তার ফলে প্রচুর পরিমাণে তেজস্ক্রিয় পদার্থ বাতাসে মিশে বায়ু দূষণ ঘটায়।

- ঘরের দেয়াল, দরজা-জানালায় যে রং করা হয়, তার থেকেও দূষণ ছড়ায়। রঙের গন্ধে অনেকসময়ই শ্বাসকষ্ট হয়, মাথা ঝিমঝিম করে।

- সিগারেট, বিড়ির ধোঁয়া আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর। ধূমপান থেকে ঘরের বাতাসে সবথেকে বেশি দূষণ ছড়ায়। এর থেকে হৃৎপিণ্ড, ফুসফুসের সমস্যা এমনকি ক্যানসারও হতে পারে।

মজার পরীক্ষা

বাতাসে ভেসে থাকা ধূলিকণাকে তুমি নিজেও খুঁজে দেখতে পারো। সকালবেলা একটা ঘরের সব জানালা-দরজা বন্ধ করে দাও। শুধুমাত্র একটা জানালা একটু ফাঁক করে রাখো, যাতে সামান্য সূর্যের আলো ঘরে আসতে পারে। লক্ষ করে দেখো অসংখ্য ধূলিকণা ঐ আলোর রেখার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।

প্রতিদিন আমাদের চারপাশের বাতাসে এরকম ধূলিকণা মিশে থাকে। আর এই বাতাস আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে দিয়ে শরীরে ঢোকে। বড়ো বড়ো শহরের যেসব অঞ্চলে শিল্প-কারখানার সংখ্যা অনেক বেশি, সেখানে বাতাসে ধূলিকণার পরিমাণও বেশি।

বায়ুদূষণের প্রতিকারের উপায়—

তুমি কী কী করতে পারো ?...

- হাঁচি বা কাশির সময় সব সময় মুখে রুমাল চাপা দেবে।
- ঘরের ভিতরে উনুন, গ্যাস বা স্টোভে রান্নার সময় ধোঁয়া বেরনোর জন্য ঘর খোলামেলা রাখা উচিত।
- ঘরের ভিতর আবর্জনা ফেলার পাত্রটা সবসময় ঢাকা দিয়ে রাখবে।
- ঘরের দেয়াল, জানালা-দরজা রং করার সময় বাতাস চলাচলের জন্য ঘর খোলামেলা রাখা উচিত ।
- দরকার না থাকলে ঘরের আলো বা পাখা জ্বালিয়ে রাখবে না।
- মশা তাড়ানোর ধূপ না জ্বালিয়ে মশারি ব্যবহার করলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে না।

- ঘরের মধ্যে কেউ ধূমপান করলে, তার ক্ষতিকারক ধোঁয়া ঘরের বাতাসে মিশে অন্যদেরও ক্ষতি করে। তাই ঘরের মধ্যে ধূমপান করতে বাধা দেবে ও বুঝিয়ে বলবে।

বায়ুদূষণের ফলাফল—

ওজোন স্তর— আমাদের রক্ষাকবচ এখন বিপদের মুখে : ফ্রিজ, এ. সি. (AC), সুগন্ধী স্প্রে, রং থেকে নির্গত ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন গ্যাস (CFC) ওজোন স্তরকে ক্ষয় করছে।

শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী বিমান (সুপারসনিক জেট), পারমাণবিক বিস্ফোরণ—এসব থেকে নির্গত নাইট্রোজেন অক্সাইড ওজোন স্তরের ক্ষতি করছে। এর ফলে ওজোন স্তর পাতলা হওয়ায় ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে এসে পৌঁছাচ্ছে। এতে ত্বকের ক্যানসার, চোখের অসুখ বেড়ে যাচ্ছে। গাছের পাতার ক্লোরোফিল নষ্ট হয়ে শস্য উৎপাদন কমে যাচ্ছে। বহু উদ্ভিদ ও প্রাণীর পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে।

অ্যাসিড বৃষ্টি— বৃষ্টির জলে অ্যাসিড : যানবাহন, কলকারখানার ধোঁয়ায় থাকা সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড—বৃষ্টির জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে অ্যাসিড তৈরি করে। এতে গাছপালার ক্ষতি হয়, মাটির গুণাগুণ নষ্ট হয়। পুকুরে, নদীতে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী মারা যায়। বৃষ্টির জলে থাকা অ্যাসিড মার্বেল পাথরে তৈরি মূর্তি, সৌধ (তাজমহল, ভিক্টোরিয়া) প্রভৃতির ক্ষতি করে। তাছাড়া বাড়ির রং নষ্ট করে। ইস্পাতের তৈরি ব্রিজের ক্ষতি করে।

বিদ্যুৎ চমকালে বা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত থেকেও এই ধরনের বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয়।

গ্রিনহাউস—পৃথিবী ! দিনের বেলা সূর্য থেকে পৃথিবীতে যে তাপ আসে রাতে সেই তাপ মহাশূন্যে ফিরে যায়। কিন্তু বাতাসে থাকা জলীয়বাষ্প, কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড প্রভৃতি—গ্রিন হাউস গ্যাসগুলি এই ফিরে যাওয়া তাপ কিছুটা শোষণ করে। ফলে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বাড়তে থাকে। গ্রিন হাউসের মতো পৃথিবীও গরম হয়ে ওঠে। এরই নাম ‘বিশ্ব উষ্ণায়ন’।

বিশেষ কথা

শীতের দেশে কাচের ঘরে তাপমাত্রা বাড়িয়ে শাকসবজি চাষ করা হয়। বিশেষভাবে তৈরি কাচের দেয়াল সূর্যের আলো ও তাপকে ভিতরে আসতে দেয় কিন্তু বেরিয়ে যেতে দেয় না। এই বিশেষ কাচের ঘর ‘গ্রিন হাউস’ নামে পরিচিত।

বায়ুদূষণ কমাতে আমরা কী কী করতে পারি ?

- প্রাইভেট মোটরগাড়ির বদলে বাস বা ট্রেনে বেশি যাতায়াত করলে বায়ুদূষণের পরিমাণ কমানো যায়। বাস বা ট্রেনের মতো ‘গণপরিবহণ’-এ অনেক লোক একসঙ্গে যাতায়াত করতে পারে। একটা বাসের বদলে রাস্তায় ৪০টা প্রাইভেট গাড়ি চললে বাতাস অনেক বেশি দূষিত হয়।

- ইলেকট্রিক ট্রেন, ট্রাম, মেট্রো, সাইকেল—এইসব দূষণহীন যানবাহন বেশি করে ব্যবহার করলে বায়ুদূষণ অনেকখানি কমানো যাবে।

- বেশি পুরানো প্রযুক্তির ইঞ্জিনযুক্ত গাড়ি ব্যবহার করা উচিত নয়। তাই বর্তমানে গাড়িগুলোতে উন্নত প্রযুক্তিতে তৈরি কম দূষণকারী ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়।

- কলকারখানা বা শিল্পকেন্দ্রগুলো লোকালয় থেকে দূরে তৈরি করা উচিত। এগুলো থেকে নির্গত বর্জ্য পদার্থগুলিকে পরিশোধন করা উচিত।

- ছোটো চারাগাছের বদলে প্রয়োজনে বড়ো গাছ কাটা উচিত। যেসব রাস্তায় বেশি যান চলাচল করে, সেখানে রাস্তার দু-পাশে বেশি করে গাছ লাগানো উচিত।

- কয়লা, পেট্রোল প্রভৃতি প্রচলিত শক্তির ব্যবহার কমিয়ে সৌরশক্তি, জোয়ার-ভাটা শক্তি, বায়ুশক্তি প্রভৃতি অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার বাড়ালে বায়ুদূষণ কম হবে।

জানো কি ?

আমাদের চারপাশের বাতাস যেভাবে দূষিত হচ্ছে, তাতে কমবয়সি শিশুদের স্বাস্থ্যের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে। কারণ মাটির কাছাকাছি বাতাসে দূষণের পরিমাণ বেশি থাকে। আর এই বয়সি শিশুরা খুব বেশি লম্বা না হওয়ায় দূষিত বাতাস তাদের শরীরে খুব বেশি পরিমাণে ঢোকে।

Earth Hour : ৩১ মার্চ, ২০০৭। অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরের মানুষ রাত সাড়ে ৮টা থেকে সাড়ে ৯টা পর্যন্ত শহরের সমস্ত আলো নিভিয়ে রেখেছিল। ‘বিশ্ব উষ্ণায়ন’ কমাতে বর্তমানে প্রায় ৮৫টা দেশের ১০০০ টা শহরের মানুষ ঐ দিনটায় ১ঘণ্টার জন্য আলো বন্ধ করে রাখে।

নীচের ছবি দুটো লক্ষ করো—

সাহানার গ্রাম

রুকাইয়ের শহর

বলোতো

- শহরাঞ্চলের আর গ্রামাঞ্চলের বাতাসের মধ্যে কোনো পার্থক্য লক্ষ করেছ?
- গ্রাম ও শহরের দুটি অঞ্চলের বাতাস কী কী ভাবে দূষিত হতে পারে? কোথাকার বাতাস বেশি দূষিত এবং কেন?

অনুসন্ধান

তোমার এলাকায় বায়ুদূষণের পরিস্থিতি কেমন বড়োদের সাহায্য নিয়ে সমীক্ষা করে দেখো।

- তোমার শহর/গ্রাম/এলাকার নাম———
- তোমার বাড়ির আশপাশে কটা বড়ো বড়ো গাছ আছে?———
- বাবা-মা/দাদু-দিদা-র কাছ থেকে জেনে নাও তোমার এলাকার গাছের সংখ্যা আগের তুলনায় বেড়েছে না কমেছে?———
- তোমার বাড়ির কাছাকাছি কোনো কলকারখানা / ইটভাটা আছে? থাকলে কটা?———
- তোমার এলাকার বড়ো রাস্তায় দিনের কোন সময় সব থেকে বেশি যানবাহন চলাচল করে?———
  ওই সময় এক ঘণ্টায় মোটামুটি কটা যানবাহন চলাচল করে?———
- তোমার বাড়ির / এলাকার কজন মানুষ বায়ুদূষণজনিত অসুস্থতায় ভুগছে?———
- তোমার বাড়ির কজন মানুষ গণপরিবহণ ব্যবহার করেন?———

৯

শব্দদূষণ

ঋভুর বাড়ি বড়ো রাস্তার ধারে। রাস্তা দিয়ে সারা দিনই নানা ধরনের যানবাহন (বাস, লরি, মোটরগাড়ি, ট্যাক্সি) চলাচল করে। দিনে রাতে কখনই বিরাম নেই। এত শব্দের মধ্যে না রাতে ভালো করে ঘুমানো যায়, না দিনের বেলা ভালো করে পড়াশোনা করা যায়।

বিমানবন্দরে কাজ করেন রীতার মা। সারাদিন বিমানের ওঠানামার শব্দে তাঁর প্রাণ ওষ্ঠাগত। কিছুদিন থেকে রীতা লক্ষ করছে তার মা কানে যেন কম শুনছেন। মেজাজও কেমন সারাদিন খিটখিটে হয়ে থাকে। ঘরে সামান্য জোরে আওয়াজেই কেমন বিরক্ত হয়ে ওঠেন।

ঋভু অথবা রীতার মা প্রতিদিন যে শব্দবহুল পরিবেশের মধ্যে থাকে সেটাই তাদের শারীরিক অসুস্থতা ও বিরক্তির প্রধান কারণ। মাত্রাতিরিক্ত ও অযাচিত শব্দ কখনই শ্রুতিমধুর হয় না, বরং তা সমস্যার সৃষ্টি করে। প্রকৃতিতে কত ধরনের শব্দই না হয়! কিন্তু তার খুব কম শব্দই আমাদের ভালো লাগে।

আসলে শব্দ যখন মানুষের পক্ষে অসহ্য, যন্ত্রণাদায়ক ও বিরক্তিকর হয় তখন তা দূষণের সৃষ্টি করে। সাধারণত দেখা যায় ৬৫ ডেসিবেলের বেশি জোরে শব্দে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর নানা শারীরিক ও মানসিক অসুবিধা হয়।

শব্দের তীব্রতা মাপার একক হলো ডেসিবেল (db)। যে যন্ত্রের সাহায্যে তা মাপা হয় তার নাম ডেসিবেল মিটার ।

- যেসব শব্দ শুনতে তোমার ভালো লাগে আর যেসব শব্দ কর্কশ ও বিরক্তিকর বলে মনে হয় তার একটা তালিকা তৈরি করে ফেলো।
- গ্রাম ও শহরে শব্দদূষণের প্রকৃতিতে কিছু পার্থক্য আছে। এই বিষয়ে একটা তুলনামূলক চার্ট তৈরি করো—

গ্রামে শব্দদূষণের উৎস	শহরে শব্দদূষণের উৎস

স্কুল, হাসপাতাল, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সামনে লাগানো ‘সাইলেন্স বোর্ড’ তুমি নিশ্চই লক্ষ করেছ ।এর মানে কী জানো? এর অর্থ এইসব প্রতিষ্ঠানের সামনে হর্ন বাজানো আইনত নিষিদ্ধ।

পিঁপি-গররর-দ্রুমদ্রুম ! শব্দদূষণ হয় কোথা থেকে ?

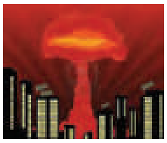

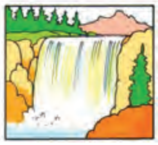

জানো কি ?— সাধারণত গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরের মানুষের ওপর শব্দদূষণের প্রভাব অনেক বেশি। শহরে যেমন যানবাহনের সংখ্যা বেশি, তেমনি কোলাহলের পরিমাণও অনেক। যার ফলে শহরের মানুষের মধ্যে শব্দদূষণের কারণে শারীরিক অসুস্থতার হারও অনেক বেশি।

কোন শব্দের তীব্রতা কতটা

শব্দ	তীব্রতা (db)	শব্দ	তীব্রতা (db)
শুনতে পাওয়া শব্দ	0	লাউডস্পিকার, মোটরহর্ন, জেনারেটর, মোটরসাইকেল	80
কানে কানে কথা	20	উচ্চস্বরে গানবাজনা	90
বাড়ির ভিতরের শব্দ	40	300 মিটার দূরের জেট প্লেন	100
সাধারণ কথাবার্তা	65	বজ্রের শব্দ, কলকারখানা, কংক্রিট ভাঙার শব্দ	110
ব্যস্ত রাস্তার যানবাহন	70	সাইরেন	130

শব্দদূষণের ফলে কী হয় ?

দ্রুম, দ্রুম, দ্রুম : ভাবো যদি তোমার কানের পাশে কেউ এরকম ড্রাম বাজাতে থাকে? ভাবতেই অসহ্য লাগছে !

- শব্দ দূষণের ফলে শোনার ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে যেতে পারে। যারা কলকারখানায় কাজ করে বা যারা খুব জোরে গানবাজনা শোনে তাদের এই সমস্যা হয়।
- অনেকক্ষণ ধরে জোরে বা একঘেয়ে শব্দ বিরক্তি, যন্ত্রণা, ক্লান্তি নিয়ে আসে। যার ফলে কাজে ভুল হয়, কাজ করতে ভালো লাগে না।
- উচ্চ রক্তচাপ, অনিদ্রা, হৃৎপিণ্ডের রোগ, চোখের রোগ, পেশির উত্তেজনা, স্নায়ুর দুর্বলতা, হজমের সমস্যা , পাকস্থলীর রোগও হতে পারে।

নিজেই বানিয়ে ফেলো

শব্দ দূষণ ম্যাপ

- বড়োদের সাথে বেরিয়ে পড়ো বাড়ি থেকে। চারদিক ঘুরেফিরে ভালো করে দেখো। লক্ষ করো কোথায় কীরকম আওয়াজ হচ্ছে। বাড়িতে এসে কাগজের ওপরে তোমার অঞ্চলের একটা ম্যাপ হাতে এঁকে ফেলো। ম্যাপের বিভিন্ন জায়গাগুলিকে শব্দের তীব্রতার মাত্রা অনুযায়ী (যেমন- বেশি মাঝারি কম) রং করো। আর বানিয়ে ফেলো তোমার অঞ্চলের শব্দদূষণের ম্যাপ।

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ

জোরে শব্দ হলে আমরা কী করি? কান চাপা দিয়ে শব্দকে আটকাই। তাহলে আমরা যদি শব্দ যেখান থেকে সৃষ্টি হচ্ছে, তাকে আটকাতে পারি, তাহলে দূষণ রোধ করা সম্ভব হবে।

★ সবচেয়ে ভালো হয় যদি শব্দ যেখানে সৃষ্টি হচ্ছে তা শব্দরোধী দেয়াল দিয়ে ঘিরে ফেলা যায় বা সাইলেন্সার লাগানো যায়।

★ শব্দের উৎস ও শ্রোতার মধ্যে দূরত্ব বাড়াতে হবে। স্কুল, হাসপাতাল ও বাড়ির চারদিকে গাছ লাগালে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কারণ গাছপালা তীব্র শব্দ প্রতিরোধ করতে পারে।

★ যন্ত্রপাতিতে তেল দিয়ে সচল রাখা উচিত, যাতে শব্দ বেশি না হয়।

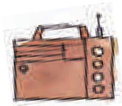

★ অকারণে হর্ন বাজানো, উচ্চস্বরে রেডিয়ো লাউডস্পিকার বাজানো, টিভি চালানো, শব্দ বাজি ফাটানো উচিত নয়।

★ কানে তুলো দিয়ে, ইয়ার প্লাগ ব্যবহার করে শব্দের আওয়াজ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। সিনেমা বা অডিটোরিয়াম হলে শব্দের তীব্রতা কমানোর যন্ত্র লাগানো থাকে।

★ শহরের নকশা এমনভাবে তৈরি করা দরকার যাতে কলকারখানা, হাইওয়ে মানুষের বসবাসের অঞ্চল থেকে দূরে থাকে।

★ যেহেতু শব্দদূষণ ব্যক্তি, সমাজ ও দেশের ক্ষতি করে তাই সরকারি স্তরে কঠোর আইন হওয়া প্রয়োজন।

ঘরের মধ্যে শব্দদূষণের উৎসগুলোকে চিহ্নিত করে লিখে অথবা এঁকে ফেলো। এই দূষণ কমাতে তুমি কী কী করতে পারো ?

১০ আমাদের দেশ ভারত

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি.......

ভারত পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ। একদিকে উজ্জ্বল অতীত, বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি, ভাষা, নানা ধর্ম-বর্ণের সহাবস্থান, অন্যদিকে ভূ-প্রকৃতির বৈপরীত্য আর সীমাহীন প্রাকৃতিক সম্পদ আমাদের দেশকে করে তুলেছে অনন্য।

‘সকল দেশের রানি সে যে – আমার জন্মভূমি!’

চলো দেখি --- আমাদের দেশটা পৃথিবীর ঠিক কোথায় আছে?

➤ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ অংশের প্রায় মাঝখানে অবস্থান করছে এই বিশাল দেশ ভারত। ভারত মহাসাগরের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত আমাদের দেশের দক্ষিণাংশ ত্রিভুজের মতো।

➤ ভারত মহাসাগরের নীল জলরাশির মধ্যে দক্ষিণ ভারতের ত্রিভুজের মতো অংশটা খুব সহজেই চোখে পড়ে।

➤ ত্রিভুজাকৃতির এই ভারতীয় উপদ্বীপের মতো, এই অংশটার পূর্বে রয়েছে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে আরব সাগর ও দক্ষিণে ভারত মহাসাগর।

নিরক্ষরেখার উত্তরে অর্থাৎ উত্তর গোলার্ধে আর মূলমধ্যরেখার পূর্বে অর্থাৎ পূর্ব গোলার্ধে রয়েছে ভারত। ভারতের মূল ভূখণ্ড দক্ষিণে ৮° ৪′ উত্তর অক্ষরেখা থেকে উত্তরে ৩৭° ৬′ উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত। আবার পশ্চিমে ৬৮°৭′ পূর্ব দ্রাঘিমারেখা থেকে পূর্বে ৯৭° ২৫′ পূর্ব দ্রাঘিমারেখার মধ্যে অবস্থিত। কর্কটক্রান্তি রেখা প্রায় মাঝখান দিয়ে গিয়ে ভারতকে উত্তর-দক্ষিণে ভাগ করেছে। আবার ৮০° পূর্ব দ্রাঘিমারেখা ভারতকে পূর্ব-পশ্চিমে ভাগ করেছে।

তিনদিকে স্থলভাগ দ্বারা বেষ্টিত জলভাগকে উপসাগর এবং তিনদিকে জলভাগ দ্বারা বেষ্টিত স্থলভাগকে উপদ্বীপ বলে।

ভারত
রাজনৈতিক মানচিত্র
আফগানিস্তান
কাবুল
ইসলামাবাদ
পাকিস্তান
চীন
নেপাল
তিব্বত
কাটমাণ্ডু
থিম্পু
ভুটান
বাংলাদেশ
ঢাকা
মায়ানমার
শ্রীলঙ্কা
শ্রী জয়বরদেনপুর
মালদ্বীপ
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
ভারত মহাসাগর
জম্মু ও কাশ্মীর
হিমাচলপ্রদেশ
পাঞ্জাব
উত্তরাখন্ড
হরিয়ানা
দিল্লী
রাজস্থান
উত্তর প্রদেশ
বিহার
সিকিম
অরুণাচল প্রদেশ
আসাম
নাগাল্যান্ড
মেঘালয়
মনিপুর
মিজোরাম
ত্রিপুরা
পশ্চিমবঙ্গ
ঝাড়খণ্ড
গুজরাট
মধ্য প্রদেশ
ছত্তিশগড়
উড়িষ্যা
মহারাষ্ট্র
তেলেঙ্গানা
অন্ধ্র প্রদেশ
গোয়া
কর্ণাটক
কেরল
তামিল নাড়ু
লাক্ষাদ্বীপ
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ
নির্দেশিকা
সীমানা :
আন্তর্জাতিক
রাজ্য
নাম-স্থান :
দেশের রাজধানী
রাজ্য রাজধানী/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল
জেলা সদর
নদী
দিল্লী
ব্যেঙ্গালুরু
হাওড়া
1 : 14 000 000

খুঁজে দেখোতো —

ভারতের মূল ভূখণ্ডের দক্ষিণতম বিন্দু ‘কন্যাকুমারিকা’।

➤কিন্তু ভারতের দক্ষিণতম স্থলবিন্দু কোনটা?

➤কর্কটক্রান্তি রেখা ভারতের কোন কোন রাজ্যের উপর দিয়ে গেছে?

কন্যাকুমারিকা

➤ ভারতের রাজ্য ও রাজধানী

বর্তমানে ভারতের রাজ্যের সংখ্যা ২৮। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সংখ্যা ৭ এবং জাতীয় রাজধানী অঞ্চল হলো নিউ দিল্লি। ১৯৫৬ সালে ভারতের রাজ্য ভাগ করার প্রধান ভিত্তি ছিল ভাষা।

➤ **সংবিধান স্বীকৃত ভাষা —** মোট ২২টি। হিন্দি, বাংলা, তেলুগু, মারাঠি, তামিল, উর্দু, গুজরাটি, মালয়ালম, কানাড়া, ওড়িয়া, পাঞ্জাবি, অসমিয়া, কাশ্মীরি, সিন্ধি, মণিপুরি, নেপালি, বোড়ো, মৈথিলি, ডোগরি, সাঁওতালি, সংস্কৃত, কোঙ্কনি।

•সংযোগকারী ভাষা — ইংরাজি।

➤ভারতের চারদিকে কী কী আছে?

ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রটা দেখো— ভারতের উত্তর- পশ্চিমে আছে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান। উত্তরে আছে চিন, নেপাল ও ভুটান। ভারতের পূর্ব দিকে দেখা যাবে মায়ানমার, বাংলাদেশ ও বঙ্গোপসাগর। পশ্চিমে রয়েছে আরবসাগর। একেবারে দক্ষিণে রয়েছে ভারত মহাসাগর ও শ্রীলঙ্কা।

রাজ্য ভাগ করা ভারতের মানচিত্রে রাজ্য ও রাজধানীর নাম লিখে অভ্যাস করো।

➤ আমাদের প্রতিবেশী দেশ

তোমার বাড়ির আশে-পাশে যারা থাকে তারা হলো তোমার প্রতিবেশী। তেমনি কোনো দেশের আশে-পাশে অবস্থিত দেশগুলোকে ওই দেশের প্রতিবেশী দেশ বলে।

ভারতের প্রতিবেশী দেশের নামগুলো মানচিত্র দেখে জেনে নাও।

এক নজরে ভারত

- **মূল ভূখণ্ডের বিস্তার :**
  উত্তর-দক্ষিণে — ৩২১৪ কিমি
  পূর্ব-পশ্চিম — ২৯৩৩ কিমি
- **আয়তন** — ৩২, ৮৭, ৭৮২ বর্গ কিমি
- **আয়তনে পৃথিবীতে ভারতের স্থান**— সপ্তম (রাশিয়া , কানাডা , চিন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল ও অস্ট্রেলিয়ার পরে)।
- **জনসংখ্যা** — ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে প্রায় ১২১ কোটি।
- **জনসংখ্যার বিচারে পৃথিবীতে ভারতের স্থান** —দ্বিতীয় (চিনের পরেই)।
- **সাক্ষরতার হার**— ৭৪.০৪ শতাংশ।
- **রাজধানী** — নিউ দিল্লি।
- **বৃহত্তম শহর** — মুম্বই।
- **ভারতের বৃহত্তম রাজ্য** — রাজস্থান।
- **ভারতের ক্ষুদ্রতম রাজ্য** — গোয়া।
- **সবচেয়ে জনবহুল রাজ্য** — উত্তরপ্রদেশ।
- **সবথেকে জনবিরল রাজ্য** —সিকিম।

দেখোতো বলতে পারো কিনা —

- নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে ভারতের কোন কোন রাজ্যের সীমানা স্পর্শ করে আছে?
- পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া আর কোন কোন রাজ্যের সীমানা বাংলাদেশকে স্পর্শ করে আছে?

ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

➤ ভারতের বিশ্ব-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-স্থান--- খাজুরাহো, অজন্তা-ইলোরার গুহা, কোনারক দিল্লির হুমায়ুনের সমাধি, আগ্রার তাজমহল।

➤ ভারতের বিশ্ব-প্রাকৃতিক ঐতিহ্য-স্থান— সুন্দরবন জাতীয় বনাঞ্চল, নন্দাদেবী শৃঙ্গ, কাজিরাঙা অভয়ারণ্য।

ভারতে আরো অনেক বিশ্ব-সাংস্কৃতিক ও বিশ্ব-প্রাকৃতিক ঐতিহ্য-স্থান আছে। সেগুলো সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করো।

মজার খেলা

মনে করো, তুমি ভারতের এক শহর থেকে আর এক শহরে বেড়াতে যাবে। মানচিত্র দেখে (৬৬ পৃ:) খুঁজে বার করে ফেলো — কোন কোন রাজ্যের ওপর দিয়ে তোমাকে যেতে হবে।

এক শহর থেকে অন্য শহর	যে রাজ্যগুলোর ওপর দিয়ে যেতে হবে	শহরগুলো কেন বিখ্যাত জানার চেষ্টা করো
১. শ্রীনগর — চেন্নাই		
২. দিল্লি — কলকাতা		
৩. শিলং — গান্ধীনগর		
৪. পাটনা — তিরুবনন্তপুরম		
৫. মুম্বই — গ্যাংটক		

➤➤বন্ধুরা মিলে পছন্দমতো আরও অনেক শহর বেছে নিয়ে এই খেলাটা খেলতে পারো।

ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশ

ভারতের ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চল ও জনজীবনে তার প্রভাব

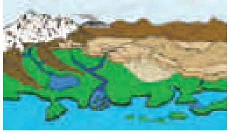

পুজোর ছুটি পড়তে আর মাত্র কয়েকদিন বাকি আছে। ক্লাসের অনেকেই পুজোর ছুটিতে বেড়াতে যাচ্ছে।

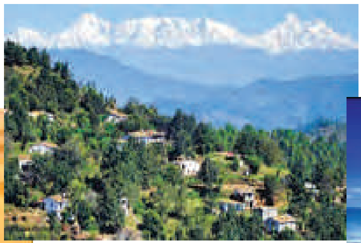

পিয়ালিরা যাচ্ছে **সিমলা**।

সৌম্যরা যাচ্ছে **রাজস্থান**।

কাকলিরা যাচ্ছে **গোয়া**।

ওরা কথা দিল ফিরে এসে সবাই— মরুভূমি, পাহাড়, মালভূমি বা সমুদ্রে বেড়াতে যাওয়ার গল্প বলবে।

ভূপ্রকৃতি হলো ভূমির প্রকৃতি। ভারতের মতো বিশাল দেশের ভূ-প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য যথেষ্ট বেশি।

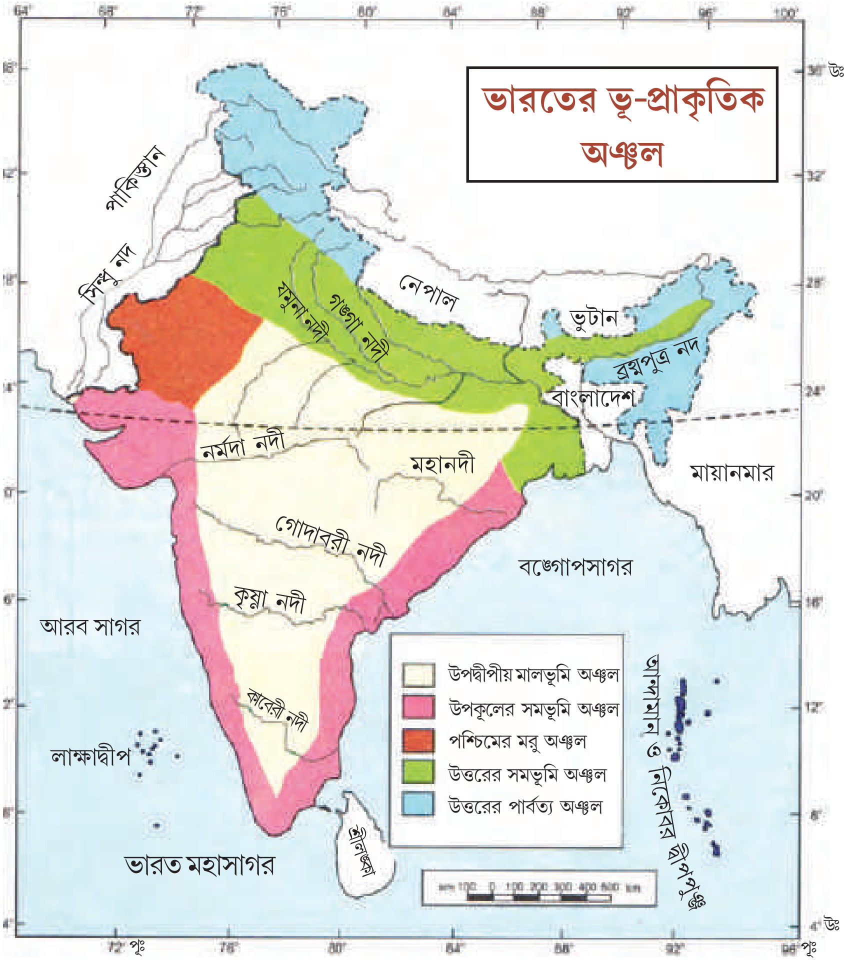

ভূ-প্রকৃতির বৈচিত্র্য অনুসারে ভারতকে সাধারণত পাঁচটি ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়—

- উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল
- উত্তরের নদীগঠিত সমভূমি অঞ্চল
- উপদ্বীপীয় মালভূমি অঞ্চল
- পশ্চিমের মরু অঞ্চল
- উপকূলের সমভূমি অঞ্চল ও দ্বীপপুঞ্জ।

ভারত—প্রাকৃতিক মানচিত্র

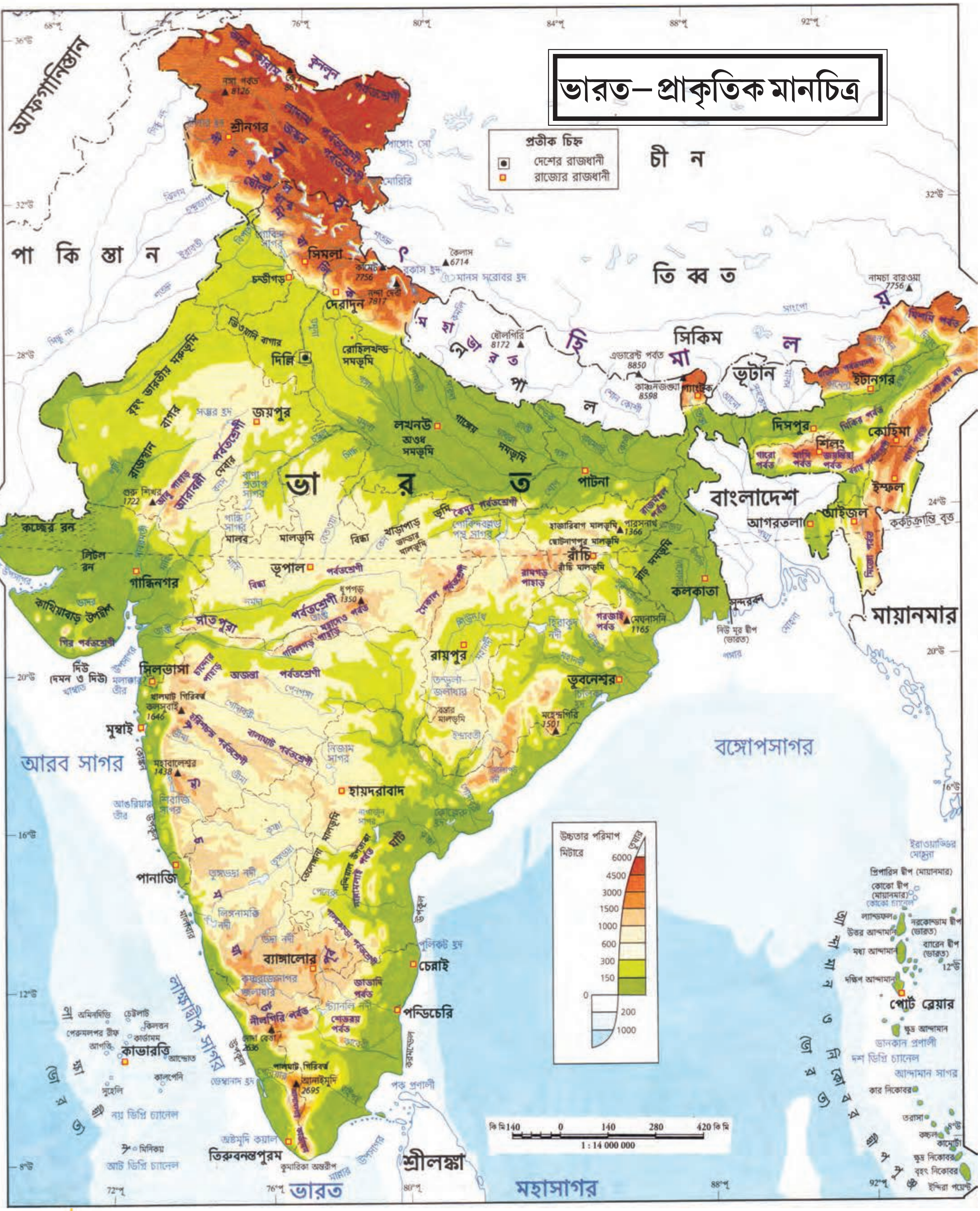

(১) উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল

ভারতের একেবারে উত্তরে রয়েছে উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল। এই অঞ্চলটি ভারতের উত্তর-পশ্চিমে জম্মু ও কাশ্মীর থেকে শুরু করে উত্তর-পূর্বে অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত ধনুকের আকারে অবস্থান করছে। হিমালয় ও কারাকোরাম হলো এখানকার প্রধান পর্বতশ্রেণি। কারাকোরাম পর্বতের গডউইন অস্টিন (৮,৬১১ মি) ভারতের উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ, যা আবার পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম । উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে অনেক হিমবাহ দেখা যায় যেমন—সিয়াচেন (ভারতের দীর্ঘতম হিমবাহ), জেমু । এই সকল হিমবাহ থেকে গঙ্গা, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্রের মতো নদনদী সৃষ্টি হয়েছে। এই পার্বত্য অঞ্চলে কতগুলো গিরিপথ রয়েছে। যেমন— বানিহাল, জোজিলা, নাথুলা।

ভারতের উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের সব থেকে উল্লেখযোগ্য পর্বতশ্রেণি হলো হিমালয়। হিমালয় কথার অর্থ 'বরফের গৃহ' (হিম + আলয়)। হিমালয়ের উত্তর থেকে দক্ষিণে তিনটে সমান্তরাল পর্বতশ্রেণি দেখা যায় — একেবারে উত্তরে হিমাদ্রি (গড় উচ্চতা ৬০০০ মি এর বেশি), তার দক্ষিণে হিমাচল (গড় উচ্চতা ৩০০০ মি এর বেশি) ও একেবারে দক্ষিণে শিবালিক (গড় উচ্চতা ১৫০০ মি এর কম)।

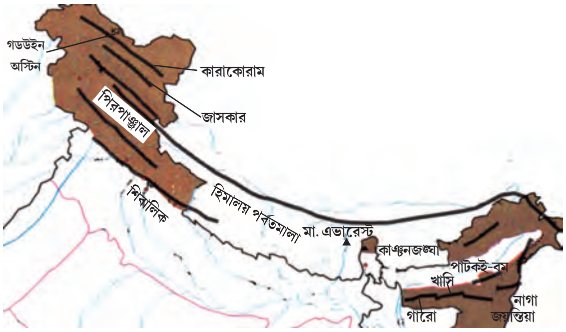

জানো কী ?

পর্বতশৃঙ্গ- পর্বতের চূড়া।

পর্বতশ্রেণি- অনেকগুলো পর্বতের সারিবদ্ধভাবে অবস্থান।

পর্বতগ্রন্থি- যে উঁচু জায়গা থেকে একাধিক পর্বতশ্রেণি বিভিন্ন দিকে বিস্তৃত হয়। যেমন পামীর গ্রন্থি থেকে কারাকোরাম ও হিমালয়ের মতো কয়েকটা পর্বতশ্রেণি নানা দিকে বিস্তৃত হয়েছে।

উপত্যকা- দুটো পর্বতের মাঝের নীচু অংশ।

গিরিপথ- দুটো পর্বতের মাঝের সংকীর্ণ প্রাকৃতিক পথ।

হিমবাহ- চলমান বরফের স্তূপ যা অভিকর্ষের টানে, ভূমির ঢাল বেয়ে অগ্রসর হয়।

➤ হিমাদ্রি

এই অংশের উচ্চতা সবচেয়ে বেশি। পর্বতশৃঙ্গগুলোতে সারা বছর বরফ জমে থাকে। এই অংশের মাউন্ট এভারেস্ট (৮,৮৪৮ মি) পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। ভারত-নেপাল সীমান্তে অবস্থিত কাঞ্চনজঙ্ঘা (৮,৫৯৮ মি) পৃথিবীর তৃতীয় উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ। মাকালু, ধবলগিরি, অন্নপূর্ণা-শৃঙ্গগুলো হিমালয়ের এই অংশে অবস্থিত।

মাউন্ট এভারেস্ট

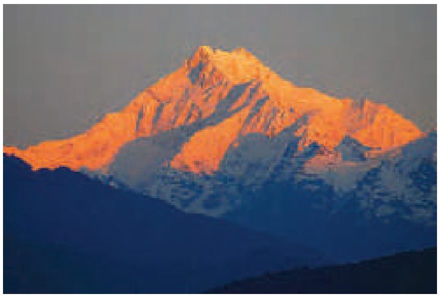

কাঞ্চনজঙ্ঘা

ঠিক ঠিক লিখে ফেলো-

- ➤ পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ ———— ।
- ➤ ভারতের উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ ———— ।
- ➤ পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ ———— ।
- ➤ পৃথিবীর তৃতীয় উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ ————।
- ➤ ভারতে অবস্থিত হিমালয়ের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ ————।

➤ হিমাচল

কাশ্মীর উপত্যকা

হিমাদ্রির দক্ষিণে অবস্থিত। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের পিরপাঞ্জাল আর হিমাচল প্রদেশের ধওলাধর পর্বতশ্রেণি এই অংশে লক্ষ করা যায়। হিমাদ্রি হিমালয় ও পিরপাঞ্জালের মাঝে রয়েছে কাশ্মীর উপত্যকা। দার্জিলিং, মুসৌরি, মানালি, নৈনিতাল, সিমলার মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে বহু পর্যটক প্রতি বছর এই পাহাড়ি শহরগুলোতে বেড়াতে আসেন।

➤ শিবালিক

হিমাচলের দক্ষিণে অবস্থিত। শিবালিক ও হিমাচল হিমালয়ের মাঝের সংকীর্ণ উপত্যকাকে 'দুন' বলে। যেমন— দেরাদুন। শিবালিক হিমালয়ের পাদদেশের ঘন অরণ্যাবৃত অঞ্চল হলো 'তরাই'। ভারতের পূর্ব সীমানা বরাবর রয়েছে পাটকই-বুম আর নাগা পর্বত। মেঘালয় রাজ্যে রয়েছে গারো, খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়।

হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল অসমতল হওয়ায় যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো নয়। এছাড়া প্রচণ্ড ঠান্ডার জন্য বেঁচে থাকা খুব কষ্টকর। পাথুরে মাটির জন্য চাষবাস ভালো হয় না। ফলে এখানে মানুষের বসবাস তুলনামূলকভাবে কম। তবে সম্প্রতি পার্বত্য অঞ্চলে জনবসতি বাড়ছে কেন বলতে পারো?

২) উত্তরের নদীগঠিত সমভূমি অঞ্চল

উত্তরে হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল ও দক্ষিণে উপদ্বীপীয় মালভূমি অঞ্চলের মাঝখানে এই সমভূমি অঞ্চল অবস্থিত (গড় উচ্চতা ৩০০ মি)। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম-এই রাজ্যগুলোর মধ্যে এই সমভূমি অবস্থিত। সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এই সমভূমি অঞ্চলের প্রধান নদনদী। এই নদীগুলো হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল থেকে নুড়ি, কাঁকড়, পলি বয়ে এনে এই সমভূমির সৃষ্টি করেছে। এই নদীগঠিত সমভূমি অঞ্চলের মাটি খুবই উর্বর, তাই চাষবাস খুব ভালো হয়। সমতলভূমি হওয়ায় যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো। সেই কারণে এই অঞ্চলে প্রচুর মানুষ বসবাস করে।

- উত্তর ভারতের সমভূমি অঞ্চল তথা ভারতের প্রধান নদী গঙ্গা।

গঙ্গা নদী

১.গঙ্গোত্রী হিমবাহের গোমুখ তুষারগুহা থেকে উৎপন্ন। প্রথম অবস্থায় এর নাম ভাগীরথী।

২. উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদের কাছে প্রধান উপনদী যমুনার সাথে মিলিত হয়েছে।

৩. মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানের কাছে পদ্মা ও ভাগীরথী-হুগলি নামে দুটি শাখায় ভাগ হয়েছে।

৪. প্রধান শাখাটি পদ্মা নামে বাংলাদেশে এবং অপরটি ভাগীরথী-হুগলি নামে পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে।

এক নজরে গঙ্গা

- দৈর্ঘ্য: ২৫০০ কিমি।
- ভারতের দীর্ঘতম নদী।
- উপনদী: যমুনা, শোন, গোমতী, গণ্ডক, কোশী ইত্যাদি।
- প্রবাহ পথে গড়ে ওঠা প্রধান প্রধান শহর— হরিদ্বার, কানপুর, এলাহাবাদ, বারাণসী, পাটনা, কলকাতা।

ব্রহ্মপুত্র নদ

এক নজরে ব্রহ্মপুত্র

- দৈর্ঘ্য: ২৯০০ কিমি।
- তিব্বতে সাংপো নামে পরিচিত।
- উপনদী: লোহিত, মানস, তিস্তা, তোর্সা, সুবনসিরি।
- প্রবাহ পথে গড়ে ওঠা প্রধান প্রধান শহর— ইটানগর, নওগাঁও, ডিব্রুগড়, গুয়াহাটি।

১. উৎস-তিব্বতের মানস সরোবরের কাছে চেমায়ুং দং হিমবাহ ।

২.তিব্বতের পর অরুণাচল প্রদেশের মধ্যে দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে।

৩.এরপর ব্রহ্মপুত্র নামে অসমের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।

৪.বাংলাদেশে এই নদ যমুনা নামে প্রবাহিত হয়ে পদ্মার সাথে মিশেছে।

৫.পদ্মা ও যমুনার মিলিত প্রবাহ মেঘনা নামে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে।

মগজাস্ত্র !

গঙ্গার চেয়ে ব্রহ্মপুত্রের দৈর্ঘ্য বেশি হওয়া সত্ত্বেও গঙ্গা কেন ভারতের দীর্ঘতম নদী ?

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের মিলিত প্রবাহ পলি সঞ্চয় করে তৈরি করেছে পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ সমভূমি।

সিন্ধুনদ

তিব্বতের মানস সরোবরের নিকট কৈলাস পর্বতের একটি হিমবাহ থেকে এর উৎপত্তি। এরপর ভারতে প্রবেশ করে জম্মু ও কাশ্মীর এবং হিমাচল প্রদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পাকিস্তানে প্রবেশ করেছে। পাকিস্তানে এই নদী প্রধান উপনদীগুলোর সাথে মিলিত হয়েছে। এই মিলিত প্রবাহ অবশেষে আরব সাগরে গিয়ে মিশেছে।

এক নজরে সিন্ধুনদ

- দৈর্ঘ্য - ২৮৮০ কিমি।
- উপনদী - বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, শতদ্রু, বিপাশা।
- হিমাচল প্রদেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।
- প্রবাহ পথে গড়ে উঠা প্রধান প্রধান শহর - লে, শ্রীনগর।

ভারত নদীমাতৃক দেশ। ছোটো বড়ো অসংখ্য নদনদী জালের মতো প্রবাহিত হয়েছে। এই নদীগুলো জনজীবনে, কৃষিকাজে, শিল্পে, যাতায়াত ব্যবস্থায়, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এই তিনটে প্রধান নদ-নদী ছাড়াও আরো অসংখ্য নদনদী ভারতে আছে। মানচিত্র দেখে এদের অবস্থান জেনে নাও।

ঠিক ঠিক লিখে ফেলো

নদনদী	পার্শ্ববর্তী শহর	উপনদী	বিশেষ কথা
গঙ্গা			• পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মোহনায় সৃষ্টি হয়েছে। • ব্রহ্মপুত্র নদের মাজুলি দ্বীপ পৃথিবীর বৃহত্তম নদী মধ্যবর্তী দ্বীপ। • গঙ্গার তীরে ওঠা উল্লেখযোগ্য তীর্থস্থান —হরিদ্বার, বারাণসী। • 'পঞ্জাব' শব্দটির উৎপত্তি সিন্ধুর পাঁচটি উপনদী থেকে।
ব্রহ্মপুত্র			
সিন্ধু			

(৩) উপদ্বীপীয় মালভূমি অঞ্চল

উত্তরের সমভূমির দক্ষিণ দিকে অবস্থান করছে ত্রিভুজের মতো দেখতে ভারতের উপদ্বীপীয় মালভূমি অঞ্চল। মালভূমির তিন দিকই পাহাড় দিয়ে ঘেরা। উত্তরে আছে আরাবল্লী, বিন্ধ্য, সাতপুরা পাহাড়। পশ্চিমে পশ্চিমঘাট, দক্ষিণে নীলগিরি, আনাইমালাই ও পালনি এবং পূর্বে পূর্বঘাট পর্বতমালা। সমগ্র অঞ্চলটির গড় উচ্চতা ৬০০-৯০০ মি-এর মধ্যে। পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ভূমির উচ্চতা ক্রমশ কমে গেছে।

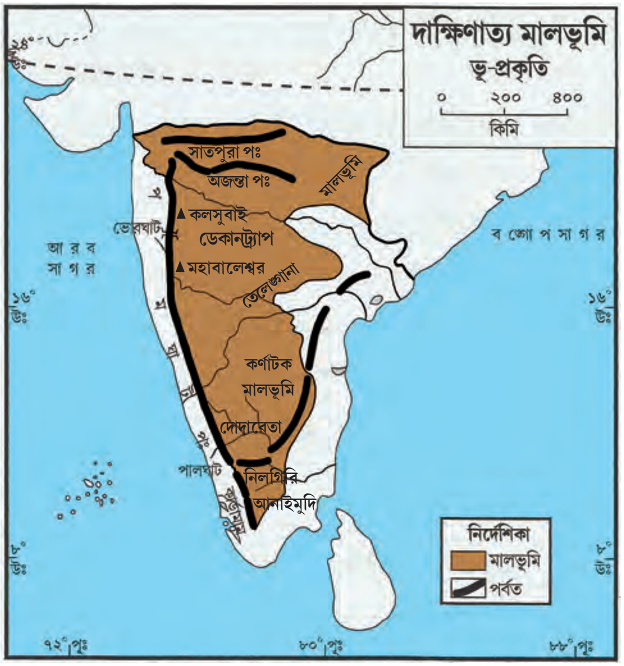

উপদ্বীপীয় মালভূমি

বিন্ধ্য পর্বত

পশ্চিমঘাট পর্বতমালা

উপদ্বীপীয় মালভূমি অঞ্চল

পূর্বঘাট পর্বতমালা

নীলগিরি পর্বত

- **নর্মদা নদী সমগ্র এলাকাকে দুটো অংশে ভাগ করেছে —**

মধ্য ভাগের উচ্চভূমি

মালব, বুন্দেলখন্ড, বাঘেলখন্ড আর ছোটনাগপুর — এরকম বহু মালভূমি এখানে দেখা যায়। খুব শক্ত প্রাচীন শিলা দিয়ে এই অঞ্চল গঠিত। এই মালভূমি অঞ্চল থেকে বহু নদী সৃষ্টি হয়েছে। যেমন -নর্মদা, তাপি, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, মহানদী।

দাক্ষিণাত্যের মালভূমি

উত্তরের বিন্ধ্য পর্বত থেকে শুরু করে ভারতীয় উপদ্বীপ পর্যন্ত অংশ দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল।

আনাইমালাই

এক নজরে পশ্চিমঘাট ও পূর্বঘাট পর্বত

- পশ্চিমঘাট পর্বতের উত্তরভাগের নাম সহ্যাদ্রি।
- আনাইমালাই পর্বতের আনাইমুদি দাক্ষিণাত্য মালভূমির উচ্চতম শৃঙ্গ।
- পূর্বঘাট পর্বতশ্রেণি একাধিক নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে। যেমন- মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী। এই নদীগুলো প্রত্যেকটাই বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। কিন্তু নর্মদা আর তাপি নদী পশ্চিম দিকে বয়ে গিয়ে খাম্বাট উপসাগরে পড়েছে।

মানচিত্র (পৃষ্ঠা৭৪) দেখে ঠিকঠিক লিখে ফেলো।

নদ-নদীগুলির নাম	উৎস	প্রবাহের দিক	মোহনা
মহানদী	দণ্ডকারণ্য উচ্চভূমির শিহাওয়া	পূর্ব	?
গোদাবরী	ত্রিম্বক উচ্চভূমি	?	?
কৃষ্ণা	পশ্চিমঘাট পর্বতের মহাবালেশ্বর	?	?
কাবেরী	কর্ণাটকের ব্রহ্মগিরি	?	?
নর্মদা	অমরকন্টক শৃঙ্গ	?	খাম্বাট উপসাগর
তাপি	মহাদেব পর্বত	?	?

দাক্ষিণাত্য মালভূমির বেশিরভাগ নদী পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়েছে কেন বলতে পারো?

জানো কি?

গোদাবরী দক্ষিণ ভারতের দীর্ঘতম নদী। এই নদীকে 'দক্ষিণ ভারতের গঙ্গা' বলা হয়।

শব্দের ধাঁধা

পাশাপাশি

- ভারতের বৃহত্তম হিমবাহ।
- ব্রহ্মপুত্র যে রাজ্যের মধ্য দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে।
- পৃথিবীর উচ্চতম পর্বত শৃঙ্গ।
- চলমান বরফের স্তূপ।
- সিন্ধু নদের মোহনা।
- পৃথিবীর বৃহত্তম নদী-মধ্যবর্তী দ্বীপ।
- গঙ্গা নদীর মোহনা।
- গঙ্গার প্রধান উপনদী।

ওপর নীচ

- দুটি পর্বতের মাঝখানে সরু পথ।
- পদ্মা ও যমুনার মিলিত প্রবাহের নাম।
- উৎস স্থলের কাছে গঙ্গা যে নামে পরিচিত।
- ব্রহ্মপুত্র নদের উৎস।
- বাংলাদেশে গঙ্গা যে নামে পরিচিত।
- গঙ্গার উৎপত্তি যে হিমবাহ থেকে।
- তিব্বতে ব্রহ্মপুত্র যে নামে পরিচিত।

চ	ক	মে	এ	আ	ন	ট	ফ	মা	জু	লী
ছ	প	ঘ	ম	ত	সি	য়া	চে	ন	ঘ	মি
অ	রু	ণা	চ	ল	প্র	দে	শ	স	ত্র	গি
চি	ভা	ঙ	ধ	ক	দ	চ	ল	স	দি	রি
হি	গী	ঘ	এ	ভা	রে	স্ট	ট	রো	ধ	প
আ	র	ব	সা	গ	র	তো	ম	ব	আ	থ
ধ	থী	ঝ	ব	ঙ্গো	প	সা	গ	র	মে	ফ
ঔ	স	থ	শ	ত্রী	দ্মা	ং	স	চ	ক	র
হি	ম	বা	হ	ষ	ঠ	পো	জ	য	মু	না

(৪) পশ্চিমের মরু অঞ্চল

রাজস্থানের একেবারে পশ্চিম দিক বরাবর অবস্থিত এই অঞ্চলটি ভারতের বৃহত্তম মরু অঞ্চল। এর নাম থর মরুভূমি। যতদূর তাকানো যায় শুধু বালি আর পাথর। কোথাও বড়ো গাছপালা নেই। খুব ছোটো ছোটো অনিত্যবহ নদী দেখা যায়। অল্প জল থাকায় নদীগুলো সমুদ্রে পৌঁছাতে পারে না। এই নদীগুলোকে অন্তর্বাহিনী নদী বলা হয় (যেমন- লুনী)। দীর্ঘদিন ধরে অল্প বৃষ্টির জন্য অঞ্চলটি মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। এখানে চাষবাস একেবারে হয় না বললেই চলে। তাই এখানে খুব কম মানুষ বসবাস করে।

(৫) উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চল

ভারতের দক্ষিণে উপদ্বীপীয় মালভূমির পশ্চিমে রয়েছে আরব সাগর ও পূর্ব দিকে বঙ্গোপসাগর। এই দুটি সাগরের তীর বরাবর গড়ে উঠেছে ভারতের উপকূলীয় সমভূমি। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ও আরব সাগরের মধ্যবর্তী অংশ পশ্চিম উপকূলের সমভূমি এবং পূর্বঘাট পর্বতমালা ও বঙ্গোপসাগরের মধ্যবর্তী অংশ পূর্ব উপকূলের সমভূমি নামে পরিচিত।

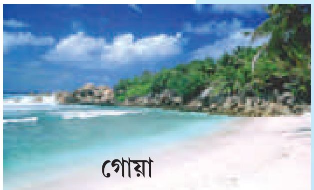

উপকূল - যে অঞ্চল বরাবর স্থলভাগ সমুদ্রে মিলিত হয়।

উপকূলীয় সমভূমি - উপকূল অঞ্চলে বালি, পলি, নুড়ি জমা হয়ে যে সমভূমির সৃষ্টি হয়।

মগজাস্ত্র !

মানচিত্র পর্যবেক্ষণ করে বলোতো গুজরাট আর অন্ধ্রপ্রদেশ - এই দুটো রাজ্যের মধ্যে কার উপকূলরেখা বেশি দীর্ঘ?

মালাবার উপকূলের উপহ্রদ গুলোকে ‘কয়াল’ বলে। উপহ্রদ হলো স্থলভাগ দ্বারা আবদ্ধ, লবণাক্ত হ্রদ যার একদিক সমুদ্রে উন্মুক্ত।

উপকূলীয় সমভূমির শ্রেণি বিভাগ	
পূর্ব উপকূলীয় সমভূমি	?
	করমণ্ডল উপকূল
পশ্চিম উপকূলীয় সমভূমি	?
	মালাবার উপকূল

- **দ্বীপপুঞ্জ:** চারদিকে জলভাগ দ্বারা বেষ্টিত ভূভাগ হলো দ্বীপ। এরকম অনেকগুলো ছোটো ছোটো দ্বীপকে একসাথে দ্বীপপুঞ্জ বলা হয়। বঙ্গোপসাগরে ২৬৫ টি ছোটো বড়ো দ্বীপ নিয়ে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ (আন্দামানের ব্যারেন এবং নারকোন্ডাম আগ্নেয় দ্বীপ) এবং আরব সাগরে ২৫টি ছোটো-বড়ো দ্বীপ নিয়ে লাক্ষাদ্বীপ গঠিত। এই দ্বীপপুঞ্জের সব দ্বীপই হলো প্রবাল দ্বীপ। প্রবাল হলো একধরনের ছোটো সামুদ্রিক কীট। কোটি কোটি প্রবাল কীটের দেহাবশেষ জমে প্রবাল দ্বীপ তৈরি হয়।

- পিয়ালি, সৌম্যরা যে যেখানে যাচ্ছে, সেই জায়গাগুলো কেমন ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত তার একটা ধারণা তুমি তোমার ভাষায় লিখে ফেলো।

ভারতের জলবায়ু

পুজোর ছুটির পর স্কুল খুলতেই টিফিনের সময় গল্পের আসর জমে উঠল।

সিমলা গিয়ে পিয়ালির ভীষণ ঠান্ডা লেগেছিল।

অপূর্ব ছোটোনাগপুর মালভূমিতে বেড়াতে গিয়ে সেখানে দিন-রাতের তাপমাত্রার মধ্যে বেশ পার্থক্য লক্ষ করেছে।

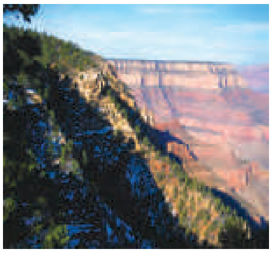

• কাকলিরা গোয়ায় বৃষ্টি পেয়েছে। এখানকার আবহাওয়া বেশ আরামদায়ক, না গরম না ঠান্ডা।

সৌম্য বলল রাজস্থানে দিনের বেলা ভীষণ গরম, কিন্তু রাতে তাপমাত্রা বেশ কমে যায়।

এবার ভেবে দেখো তো!

- সিমলাতে বেশি ঠান্ডা পড়ে কেন?
- রাজস্থানের মরু অঞ্চলে তাপমাত্রার প্রসর খুব বেশি হয় কেন?
- সমুদ্রের ধারে আবহাওয়া আরামদায়ক কেন?
- মালভূমি এলাকায় দিনেরবেলা বেশি গরম লাগে কেন?

মগজাস্ত্র!

মানচিত্রে দেখো, কর্কটক্রান্তি রেখা ভারতকে উত্তর দক্ষিণে প্রায় সমান দু ভাগে ভাগ করেছে। এর দক্ষিণ অংশে ক্রান্তীয় জলবায়ু আর উত্তর অংশে উপক্রান্তীয় জলবায়ু দেখা যায়। ভারতে কর্কটক্রান্তি রেখার দক্ষিণ অংশে গড় উষ্ণতা সারা বছর সাধারণত বেশি হয় কেন?

কোনো স্থানের অক্ষাংশগত অবস্থান সেই স্থানের জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে।

চটপট বলে ফেলো—

১) তুমি পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় থাক?

২) তোমাদের গ্রামে বা শহরে বছরের বেশিরভাগ সময়ে গরম না ঠান্ডা থাকে?

৩) ছাতা, বর্ষাতি, সোয়েটার, জ্যাকেট, মাফলার- এসব বছরের কোন কোন সময় ব্যবহার করো?

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ভূমির উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে উষ্ণতা কমতে থাকে।

কখনো জানতে ইচ্ছে করে— তুমি যেখানে থাক, সেই জায়গাটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কতটা উঁচুতে অবস্থিত?

তোমাদের বাড়ির কাছাকাছি কোনো জংশন রেল স্টেশনের ফলকের নীচে খেয়াল করে দেখবে, সেখানে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে স্টেশনটির উচ্চতা দেওয়া থাকে।

সমুদ্র থেকে দূরত্ব বাড়লে জলবায়ুর চরমভাব বাড়ে।

- গ্রীষ্মকালে অর্থাৎ এপ্রিল-মে মাসে টি. ভি, খবরের কাগজে খেয়াল করে দেখবে— মুম্বাই, কোচি, চেন্নাই, কলকাতায় বেশ গরম পড়ে। কিন্তু সেই সময় দিল্লি, লক্ষ্ণৌ, আম্বালা, চণ্ডীগড়ে আরো বেশি গরম পড়ে। কারণ সমুদ্র থেকে দূরে ঠান্ডা বা গরম দুটোই বেশি হয় বলে এই ধরনের জলবায়ুকে 'চরমভাবাপন্ন' জলবায়ু বলে। আর সমুদ্রের কাছাকাছি অঞ্চলে সমুদ্রের প্রভাবে সারাবছরই মাঝারি রকমের তাপমাত্রা থাকে, একে 'সমভাবাপন্ন' জলবায়ু বলে।

দক্ষিণ ভারত ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও সমুদ্রের কাছাকাছি হওয়ায় এখানকার জলবায়ু সমভাবাপন্ন প্রকৃতির। তবে উচ্চতার জন্য পাহাড়ি এলাকা, যেমন- কোদাইকানাল বা উটিতে সারাবছরই ঠান্ডা থাকে। আবার মধ্যপ্রদেশের ভূপাল বা রাজস্থানের জয়পুর সমুদ্র থেকে দূরে অবস্থিত বলে জলবায়ু চরমভাবাপন্ন প্রকৃতির।

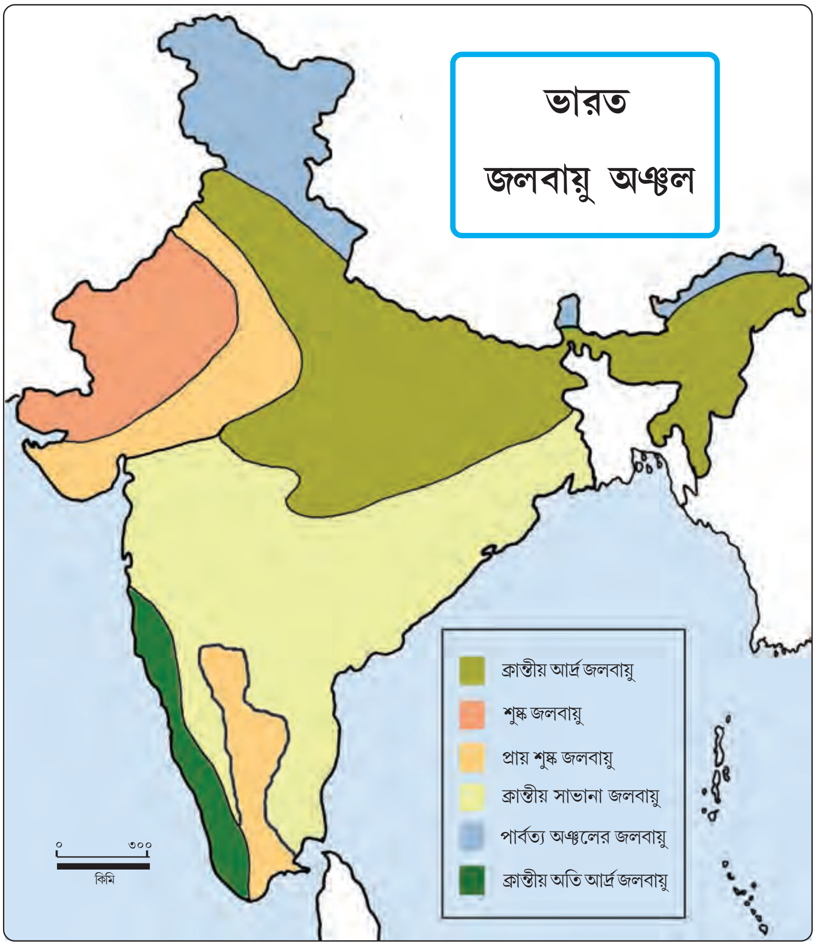

মেঘালয়ের মৌসিনরাম যেমন পৃথিবীর সর্বাধিক বৃষ্টিবহুল স্থান, তেমনি রাজস্থানের থর মরুভূমি অন্যতম বৃষ্টিবিরল অঞ্চল। জলবায়ুর এত বৈচিত্র্য থাকলেও ভারতের জলবায়ুতে মৌসুমি বায়ুর প্রভাব সবথেকে বেশি। এ কারণে ভারতকে বলা হয় ‘ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ুর দেশ’।

ভারতের জলবায়ুতে মৌসুমি বায়ুর প্রভাব: ঋতুবৈচিত্র্য

- **গরমকাল (মার্চ থেকে মে) :** সারা দেশ জুড়েই এই সময় উষ্ণতা বেশি থাকে। ভীষণ গরমে নদী-হ্রদ-পুকুর-জলাশয়ের জল প্রায় শুকিয়ে যায়। মাটির জল অনেক নীচে নেমে যায়। একমাত্র পার্বত্য অঞ্চল আর সমুদ্রের উপকূলবর্তী অঞ্চলে তাপমাত্রা কিছুটা কম থাকে। এই সময় পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের বহু জায়গায় তাপমাত্রা ৪০°সে এর ওপরে উঠে যায়।

তোমার কি গরমকাল ভালো লাগে? কেন তার কারণগুলো ভেবে লেখো।

কালবৈশাখী

গরমকালে পশ্চিমবঙ্গে মাঝে মাঝে বিকেল বা সন্ধের দিকে প্রচণ্ড বজ্র-বিদ্যুৎসহ ঝড়বৃষ্টি হয়। একে বলে ‘কালবৈশাখী’। এর ফলে উষ্ণতা কিছুটা কমে গিয়ে আবহাওয়া আরামদায়ক হয়।

লু ও আঁধি

গরমকালে উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও উত্তর ভারতের কিছু অংশে দিনের বেলায় অত্যধিক শুষ্ক ও উষ্ণ বায়ু (‘**লু**’) প্রবাহিত হয়। এর ফলে উষ্ণতা প্রায় ৫০° সে ছাড়িয়ে যায়। তীব্র তাপপ্রবাহে অনেকের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে। পশ্চিম ভারতে তখন এই তাপ প্রবাহের সাথে প্রচণ্ড ধূলিঝড়ের (**আঁধি**) সৃষ্টি হয়।

লু

আঁধি

টানা কয়েক মাস গরমের পর আজ বর্ষা নেমেছে। বৃষ্টিতে সবাই কম-বেশি ভিজে স্কুলে এসেছে। শীত শীত করছে আবার মজাও লাগছে।

- **বর্ষাকাল (জুন থেকে সেপ্টেম্বর) - মৌসুমি বায়ুর আগমনকাল:** মে-জুন মাসে ভারতে উত্তর-পশ্চিম স্থলভাগের দিকে উষ্ণতা ভীষণ বেড়ে যাওয়ায় নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। অপরদিকে বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরে উষ্ণতা তুলনায় কম হওয়ায় সেখানে উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়। ফলে বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর থেকে জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু স্থলভাগের দিকে ছুটে আসে। এই বায়ু হলো দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু।

বঙ্গোপসাগর থেকে এই বায়ু উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়ে মেঘালয়ের গারো, খাসি, জয়ন্তিয়া পাহাড়ে বাধা পেয়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। মেঘালয়ের মৌসিনরাম অঞ্চলে এই বায়ুর প্রভাবেই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত (গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১১,৮৭২ মিমি) হয়। এই বায়ুর ফলে গোটা পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

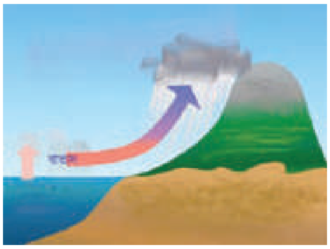

আরব সাগর থেকে এই বায়ু ভারতে প্রবেশ করে পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিম ঢালে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। পশ্চিমঘাট পর্বতের পূর্বঢালে এসে পৌঁছালে জলীয়বাষ্প কমে যাবার জন্য এই বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টি কমে যায়। একে বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল বলে।

মৌসুমি বায়ুর বৈশিষ্ট্য

- গোটা দেশে মৌসুমি বৃষ্টির অসম বণ্টন।
- মৌসুমি বায়ুর খামখেয়ালিপনার জন্য কোথাও বন্যা আবার কোথাও খরা হয়।
- অক্টোবর মাসে তামিলনাড়ু রাজ্যের করমণ্ডল উপকূলে বছরে দু বার বৃষ্টিপাত হয়।
- ভারতের কৃষিকাজ আর অর্থনীতি অনেকটাই মৌসুমি বায়ুর ওপর নির্ভরশীল।

- **শরৎকাল (অক্টোবর থেকে নভেম্বর) —মৌসুমি বায়ুর প্রত্যাবর্তনকাল:** সেপ্টেম্বর মাসের শেষ বা অক্টোবর মাসের শুরুতে স্থলভাগ থেকে জলভাগের দিকে বায়ু চলাচল করতে থাকে। এই বায়ুই হলো উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু। স্থলভাগ থেকে আসার কারণে জলীয় বাষ্প কম থাকায় এই বায়ুতে বৃষ্টি প্রায় হয় না। তবে বঙ্গোপসাগরের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু প্রচুর পরিমাণে জলীয়বাষ্প সংগ্রহ করে। এই বায়ু করমণ্ডল উপকূলে প্রচুর বৃষ্টি ঘটায়।

শীতকাল (ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি) :

এই সময় ভারতে স্থলভাগের উপর দিয়ে শীতল, শুষ্ক, উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয়। সারা ভারতে এই সময় তেমন বৃষ্টিপাত হয় না। শীতকালে মাঝে মাঝে দু-চার দিন একটানা আকাশ মেঘলা থাকে ও ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি হয়। একে পশ্চিমি-ঝঞ্ঝা (Western Disturbance) বলে। উত্তর-পশ্চিম ভারতের শীতকালে দক্ষিণ ভারতের তুলনায় উত্তর ভারতে ঠান্ডার প্রকোপ বেশি হয়। এইসময় শহরাঞ্চলে ভোরবেলা কুয়াশা আর রাতের বেলা শিশির পড়তে দেখা যায়।

তোমার প্রিয় ঋতুর বর্ণনা দাও।

লেখার সময় নীচের বিষয়গুলো মাথায় রাখো—

- ঋতুটির সময়কাল -
- ঋতুটিতে কোনো বিশেষ ধরনের ঝড়-বৃষ্টি বা অন্য কোনো জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য থাকলে, তা লেখো।
- ঋতুটিতে কী কী ফসল, ফুলফল পাওয়া যায়।
- ঐ সময় কী কী উৎসব পালিত হয়।
- ঐ সময় আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কী পরিবর্তন দেখা যায়।

ভারতে মৌসুমি বায়ুর প্রভাব

তোমরা সবাই জানো যে, ফসল চাষ কীভাবে বৃষ্টির সাথে যুক্ত। মৌসুমি বায়ু সময়ের আগে বা পরে আসার ওপর ফসল উৎপাদন নির্ভর করে। প্রত্যেক বছর বৃষ্টি একই পরিমাণে হয় না। মৌসুমি বৃষ্টি ভালো হলে কৃষকরা লাভবান হন। আবার বৃষ্টিপাত কম হলে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হন। মৌসুমি বৃষ্টির সাথে ভারতের নানা রাজ্যে নবান্ন, ওনাম, বিহু—এধরনের নানা উৎসব পালিত হয়। তবে অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যেমন (বিশেষত অসম, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর বিহার প্রভৃতি) রাজ্যে বন্যা দেখা দেয়, তেমনি কম বৃষ্টিপাত কখনো কখনো (দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন রাজ্য, রাজস্থান এবং গুজরাটের বিভিন্ন স্থানে) খরার সৃষ্টি করে।

ভারতের মাটি

ছোট্ট মেয়ে রেহানা, তোমাদেরই বন্ধু। ওর সখ বাগান করা। বাড়ির পিছনে এক চিলতে জমিতে ও বাগান করেছে। মাটি কোপানো, গাছ পোঁতা, সার দেওয়া, জল দেওয়া, আগাছা পরিষ্কার করা — সবই ও নিজের হাতে করে। একেক ঋতুতে একেক রকম ফল-ফুলের গাছ লাগায়। যখন গাছগুলোতে ফল ধরে, ফুল ফোটে ওর মন খুশিতে ভরে যায়। পাড়ার সব বন্ধুদের ডেকে আনে। এবারের শীতে ওর বাগানে টম্যাটো, ঢ্যাঁড়স আর বেগুন হয়েছিল। তাই ও মনে মনে ভাবে, ‘মাটি প্রকৃতির দান’। মাটি আছে বলেই আমরা বেঁচে আছি। রেহানার মতো তোমরা কখনো ভেবে দেখেছ — **মাটি কী ?**

মাটি হলো ভূপৃষ্ঠের ওপরের পাতলা স্তর যেখান থেকে উদ্ভিদ পুষ্টি পায়। ভেঙে যাওয়া শিলার সূক্ষ্ম দানা, জীবিত ও মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহ, খনিজ পদার্থ, জল, বাতাস মাটি তৈরিতে সাহায্য করে।

মাটি সৃষ্টি

জলবায়ু, আদি শিলা, জৈব পদার্থ, ভূপ্রকৃতি ও সময়ের ওপর নির্ভর করে মাটি তৈরি হয়। মাটি তৈরিতে অনেক সময় লাগে। যত বেশি সময় ধরে তৈরি হয়, মাটি তত পরিণত হয়।

ভারতের বিভিন্ন জায়গার মাটি

ভারতের মতো বিশাল দেশে নানা ধরনের মাটি দেখতে পাওয়া যায়।

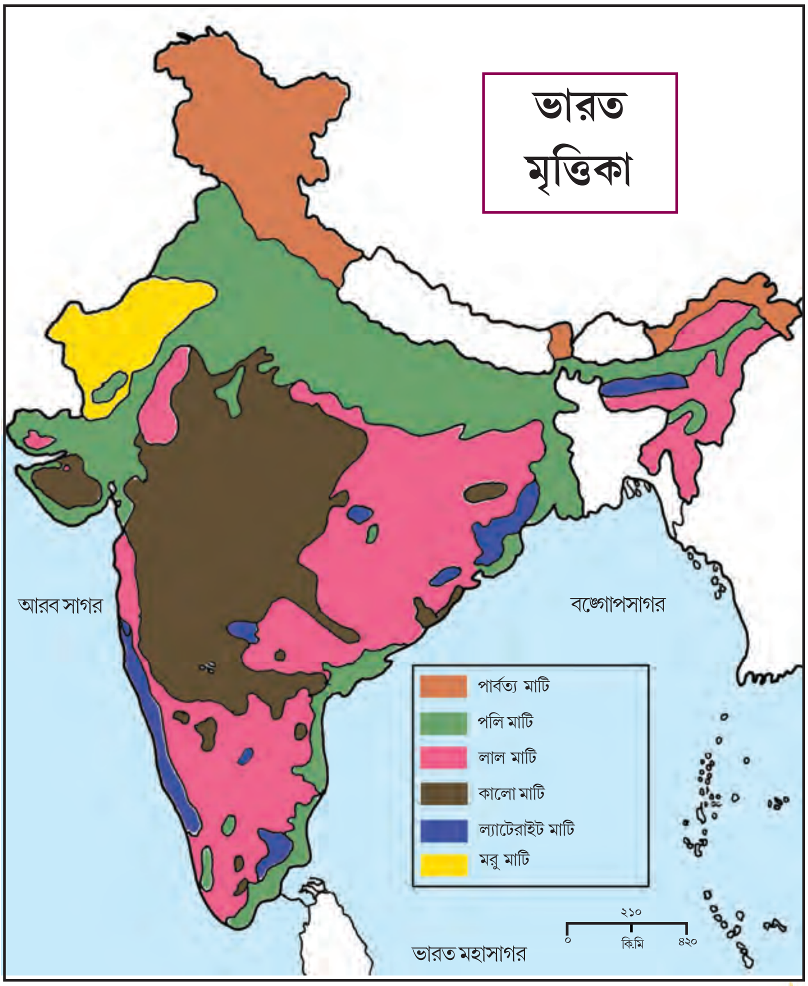

পলি মাটি : মূলত নদীবাহিত পলি থেকে এই মাটি সৃষ্টি হয়। পলিমাটি উর্বর হওয়ায় এই মাটিতে প্রায় সবরকম ফসলই চাষ করা যায়। নদীর প্লাবনভূমি, বদ্বীপ অঞ্চলে পলিমাটি দেখা যায়। ভারতে উর্বর নবীন পলিমাটি 'খাদার' আর অনুর্বর প্রাচীন পলিমাটি 'ভাঙর' নামে পরিচিত। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও অসমের একটা বড়ো অংশে পলিমাটি দেখা যায়।

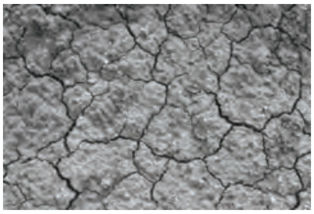

কালো মাটি : ব্যাসল্ট শিলা গঠিত অঞ্চলে এই মাটি দেখা যায়। এর জলধারণ ক্ষমতা খুব বেশি। এই মাটি যথেষ্ট উর্বর। তুলো, আখ ও চিনাবাদাম চাষের জন্য এই মাটি আদর্শ। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশের বেশির ভাগ অংশে এবং কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশের কিছু অংশে এই মাটি দেখা যায়।

লাল মাটি : রূপান্তরিত শিলা বহু বছর ধরে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে এই মাটি সৃষ্টি হয়। লোহার পরিমাণ বেশি থাকে বলে এর রং লাল। এই মাটিতে জলসেচ ও সারের সাহায্যে চাষ-আবাদ করা যায়। রাগি, বাদাম, তামাক, ধান, ছোলার চাষ হয় এই মাটিতে। ওড়িশা, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, কেরালা, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম অংশে এই মাটি দেখা যায়।

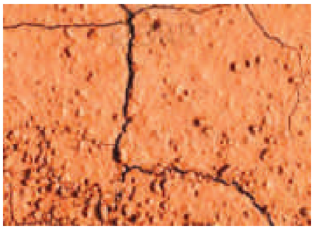

ল্যাটেরাইট মাটি : খুব বেশি উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চলে যেখানে পর্যায়ক্রমে শুষ্ক ও আর্দ্র ঋতু দেখা যায় সেখানে এই মাটি সৃষ্টি হয়। লৌহ অক্সাইডের উপস্থিতির জন্য এই মাটির রং ইটের মতো গাঢ় লাল। এই মাটি অনুর্বর। । চিনেবাদাম, জোয়ার, বাজরা, রাগি এই মাটিতে চাষ হয়। ছোটোনাগপুর মালভূমি, পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বতের কিছু অংশে এবং মেঘালয় মালভূমির বেশিরভাগ অংশে ল্যাটেরাইট মাটি দেখা যায়।

মরু অঞ্চলের মাটি : খুব কম বৃষ্টিপাত ও অত্যধিক উষ্ণতা যুক্ত অঞ্চলে এই মাটি সৃষ্টি হয়। এই মাটি মোটাদানা ও ছিদ্রযুক্ত। জলধারণ ক্ষমতা কম এবং অনুর্বর। অত্যধিক বাষ্পীভবনের কারণে এই অঞ্চলে মাটিতে লবণের পরিমাণ বেশি। প্রধানত জোয়ার, বাজরা, রাগি (যাকে এককথায় মিলেট জাতীয় শস্য বলে) চাষ করা হয়। রাজস্থানের মরু অঞ্চলে এই মাটি দেখা যায়।

পার্বত্য অঞ্চলের মাটি : প্রধানত আর্দ্র-নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে এরকম মাটি সৃষ্টি হয়। এতে বেশি পরিমাণে জৈব পদার্থ থাকে। চা, কফি, বিভিন্ন ধরনের মশলা, এই মাটিতে খুব ভালো চাষ হয়। হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল, পশ্চিমঘাট পর্বত এবং দাক্ষিণাত্যের নীলগিরি পার্বত্য অঞ্চলে এই মাটি দেখা যায়।

তোমার আশেপাশের অঞ্চলের মাটিতে কী কী কীট-পতঙ্গ ও প্রাণী আছে লক্ষ করে একটা তালিকা তৈরি করো।

■ নদীতীরের মাটি, তোমার অঞ্চলের আশেপাশের পুকুর-জলাশয়ের মাটি, স্কুল বা খেলার মাঠের মাটি, চাষের জমির মাটি, রাস্তার ধারের মাটি আর তোমার বাড়ির বাগান বা টবের মাটির মধ্যে বৈশিষ্ট্যের (রং, শক্ত না নরম, দানা সূক্ষ্ম/মোটা) দিক থেকে কী পার্থক্য লক্ষ করছ নিজের ভাষায় লিখে ফেলো।

■ তোমার বাড়ি বা স্কুলের চারপাশের নানা জায়গা থেকে কিছু কিছু মাটি সংগ্রহ করো। এবার জলের মধ্যে ঐ মাটিগুলো আলাদাভাবে গুলে দিয়ে দেখোতো, প্রতিটা নমুনাতে কিছু পার্থক্য পাও কিনা?

এক নজরে

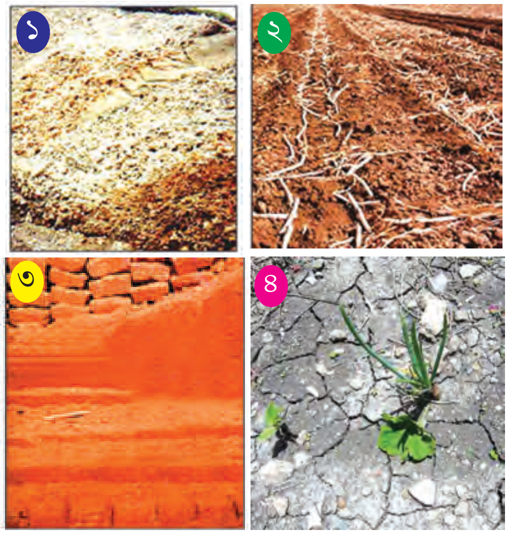

• চিনে নিয়ে মাটির নাম ও দুটো করে বৈশিষ্ট্য লিখে ফেলো—

১) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

২) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

৩) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

৪) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

মাটি ক্ষয়

কীসের ছবি বলোতো ?

জানো কী ?

মেঘালয় রাজ্যের চেরাপুঞ্জিতে প্রচুর বৃষ্টি হয় তবুও এখানে বিশেষ চাষবাস করা যায় না। কারণ প্রচণ্ড বৃষ্টিতে মাটি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ধুয়ে যায়।

- গাছের শিকড় মাটিকে খুব শক্ত করে ধরে রাখে। তবে আজকাল নানা কারণে অনেক গাছ কাটা হচ্ছে। তাই বৃষ্টির সময় উপরের স্তরের মাটি ধুয়ে যাচ্ছে। এছাড়া খনিজ সম্পদ উত্তোলনের সময় বা বিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলার সময় প্রচুর মাটি ক্ষয় হয়। বেশি পরিমাণে পশুচারণের ফলেও পরোক্ষভাবে মাটি ক্ষয় হয়।

■ তোমার অঞ্চলের মাটি পর্যবেক্ষণ করে দেখো—

- মাটির রং কেমন ?
- মাটি মিহি না মোটা দানার ?
- মাটি বেশি শক্ত না নরম ?
- মাটিতে কী কী গাছ দেখতে পাও ?
- মাটিতে কী কী চাষ করা হয় ?
- মাটি কী কাজে ব্যবহৃত হয় ?

মাটি সংরক্ষণ

মাটির উপরের স্তরে নানা জৈব পদার্থ থাকে। এই স্তর ক্ষয় হলে মাটি সাধারণত অনুর্বর হয়ে পড়ে। মাটি আমাদের নানা প্রয়োজনে লাগে। উদ্ভিদের জন্মানো চাষবাস, ঘরবাড়ি নির্মাণ, বিভিন্ন জীবের আবাসস্থল প্রভৃতি কারণে মাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তাই মাটি সংরক্ষণ করা দরকার।

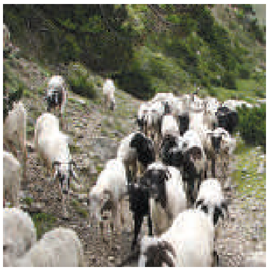

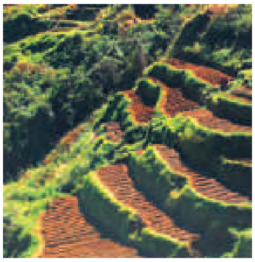

- পশুচারণ নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় করা উচিত।
- মাটির বেশি গভীরের খনিজ সম্পদ আহরণ বন্ধ করা উচিত।
- পাহাড়ের ঢালু অংশে ধাপ কেটে চাষ করা উচিত।
- গাছ কাটা বন্ধ করা উচিত।
- অনেক বেশি সংখ্যায় চারাগাছ লাগানো উচিত।
- বেশি ঢাল যুক্ত অংশে রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, নির্মাণ করা উচিত নয়।

ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিদ

নীচের ছবিগুলো দেখো। আন্দাজ করে লিখে ফেলো এই গাছগুলোর কোনটা ভারতের কোন অঞ্চলে দেখা যায়।

______________ ______________ ______________ ______________

ভেবে দেখেছ—

ভারতের বিভিন্ন জায়গার স্বাভাবিক উদ্ভিদের মধ্যে কত বৈচিত্র্য ! এই বৈচিত্র্য কেন হয় ?

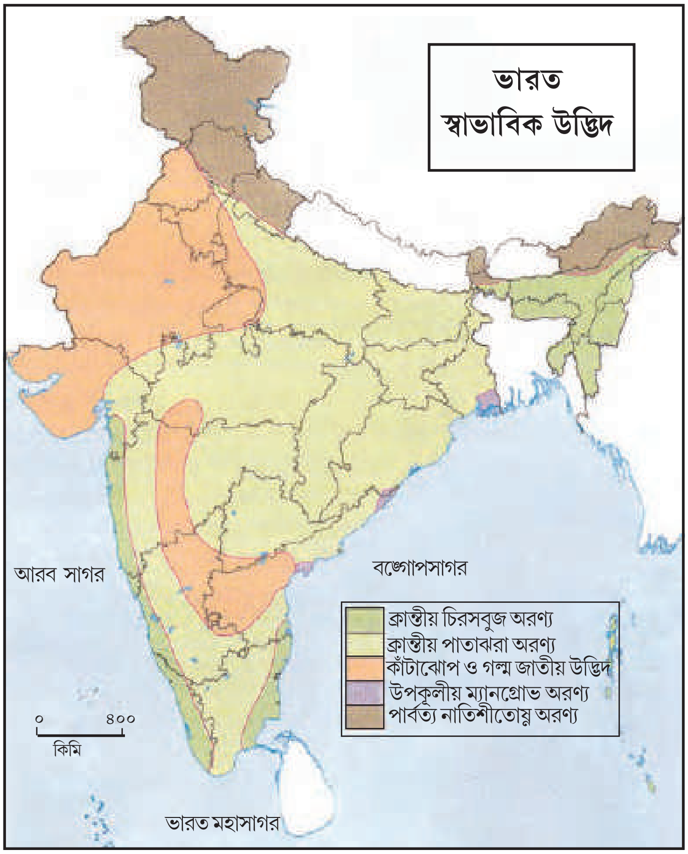

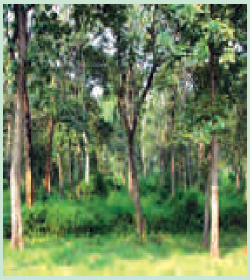

মানুষের চেষ্টা ছাড়া শুধুমাত্র প্রকৃতির উপরে নির্ভর করে জন্মানো গাছপালাই হলো স্বাভাবিক উদ্ভিদ।

কৃষকরা মাঠে যে ফসল উৎপাদন করে বা আমরা টবে যে গাছ লাগাই— সেগুলো কি স্বাভাবিক উদ্ভিদ ?

ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিদের বৈচিত্র্য লক্ষ করার মতো। ভারতে প্রায় ৫০০০ রকমের গাছ দেখা যায়। স্বাভাবিক উদ্ভিদের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য অনুসারে এদের নামকরণ করা হয়েছে। ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিদকে সাধারণভাবে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়।

ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিদের পরিচয়

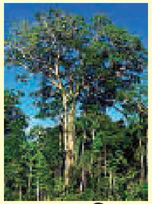 মেহগনি			● সারা বছর গাছের পাতা সবুজ থাকে। ● গাছের গুঁড়ি মোটা। ● কাঠ শক্ত ও ভারী। ● গাছের দৈর্ঘ্য বেশি।	আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিম ঢাল, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহ, পশ্চিমবঙ্গের ডুয়ার্স অঞ্চল।
সেগুন			● শুষ্ক ঋতুতে গাছের পাতা ঝরে যায়। ● চিরসবুজ গাছের থেকে দৈর্ঘ্যে সামান্য কম।	সমগ্র গাঙ্গেয় সমভূমি, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, অসম, ভারতের উপদ্বীপীয় মালভূমি ও হিমালয়ের পাদদেশীয় অঞ্চল।
ক্যাকটাস			অত্যধিক বাষ্পীভবনের জন্য গাছ মাটি থেকে জল কম পায়। তখন প্রস্বেদন কমাতে পাতাগুলো খুব ছোটো হয়, কখনো কখনো কাঁটায় পরিণত হয়।	রাজস্থান, গুজরাট, হরিয়ানা, পাঞ্জাব -এর উত্তর পশ্চিম অংশ।

ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিদ	প্রাকৃতিক পরিবেশ	প্রধান গাছ	গাছের বৈশিষ্ট্য	ভারতের কোথায় কোথায় দেখা যায়
উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ বা লবণাম্বু অরণ্য সুন্দরী	● উপকূল অঞ্চলে জোয়ারের জল মাটিকে লবণাক্ত করে। ● বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ২৫° থেকে ৩৫° সে. এবং বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৫০ সেমির বেশি।	সুন্দরী, গরান, হেতাল, হোগলা, গোলপাতা।	● শ্বাসমূল ও ঠেসমূল দেখা যায়।	পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন, ওড়িশার চিল্কা উপহ্রদ, অন্ধ্রপ্রদেশের কোলেরু ও পুলিকট উপহ্রদ, গুজরাটের কচ্ছ ও খাম্বাট উপসাগরের তীরবর্তী এলাকা।
পার্বত্য নাতিশীতোষ্ণ অরণ্য 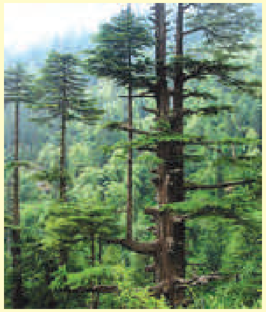 দেবদারু	● ১৫০০ মিটারের বেশি উঁচু অঞ্চল। ● বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ১৫° সে-এর কম। তুষারপাত বা বৃষ্টিপাত ৫০-১০০ সেমি।	পাইন, ফার, স্প্রুস, বার্চ, সিডার, দেবদারু, ওক লার্চ, পপলার, উইলো।	● পাতাগুলো সুঁচালো হওয়ায় বরফ জমে থাকতে পারে না। ● গাছগুলো দেখতে মোচার মতো। ● সোজাভাবে অনেকদূর পর্যন্ত উঠে যায়। ● কাণ্ড নরম।	হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, সিকিম, দার্জিলিং, অরুণাচল প্রদেশ, নীলগিরি ও আনাইমালাই পর্বতের উঁচু অংশ।

অরণ্য আমাদের বন্ধু

- কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে ও বাতাসে অক্সিজেন যোগ করে
- কাঠশিল্প ও কাগজশিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ করে
- বৃষ্টিপাত ঘটাতে সাহায্য করে
- বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখে
- বন্যা ও খরা নিয়ন্ত্রণ করে
- মধু, মোম, গঁদ, রজন, আঠা পাওয়া যায়
- মাটি ক্ষয় কমায়
- বন্য প্রাণীর আবাসস্থল

অরণ্য সংরক্ষণ : অরণ্যের গুরুত্ব বুঝতে পেরে মানুষ এখন অরণ্য বাঁচানোর দিকে নজর দিয়েছে। তার জন্য যে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে—

- নিজের এলাকার সবাই মিলে নদী, লাইব্রেরি, খেলার মাঠ, স্কুল, রাস্তাঘাট, পুকুর, ধর্মীয় স্থান সংলগ্ন স্থানে গাছ লাগিয়ে গাছের সংখ্যা বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে।
- পশুচারণ নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।
- চোরাচালানকারীদের বনে ঢুকতে বাধা দেওয়া হচ্ছে।
- আইন করে গাছকাটা বন্ধ করা হচ্ছে।

- স্বাভাবিক উদ্ভিদ দ্বারা তুমি কীভাবে উপকৃত হও?
- গাছ কেটে ফেললে কী কী ক্ষতি হতে পারে বলে তোমার মনে হয়?

বলো তো—

- সারাবছর গাছের পাতা সবুজ থাকার কারণ কী?
- নির্দিষ্ট ঋতুতে গাছের পাতা ঝরে যায় কেন?
- সরলবর্গীয় গাছের পাতাগুলো কেমন দেখতে হয়?
- কাঁটা গাছের কাঁটাগুলো আসলে গাছের কোন অংশ?

বিশ্ব অরণ্য দিবস— ২১ মার্চ

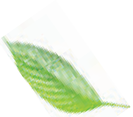

- তুমি অরণ্য বাঁচাতে কী কী ব্যবস্থা নেবে?
- গাছকাটা বন্ধ করতে ক্লাসে বন্ধুরা মিলে পোস্টার তৈরি করো।

সবুজ বাহিনীর ভেষজ বাগান

● সর্দি কাশি সারায়
● ত্বক ভালো রাখে।
● ভারতের প্রায় সব রাজ্যে পাওয়া যায়।

● ত্বক, লিভার, দাঁত ও চুল ভালো রাখে।
● পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্যে পাওয়া যায়।

● কুইনাইন তৈরি হয়, যা ম্যালেরিয়ার উপশম ঘটায়।

● দার্জিলিং জেলার মংপুতে পাওয়া যায়।

● হাঁপানি, সর্দি-কাশি, পেটের অসুখের উপশম হয়।
● হৃৎপিণ্ড ভালো রাখে।
● ভারতের প্রায় সব রাজ্যে পাওয়া যায়।

● রেসারপিন তৈরি হয়, যা উচ্চ রক্তচাপ কমায়।
● পশ্চিমঘাট পর্বতের আর্দ্র অরণ্যে পাওয়া যায়।

● লিভারের ও পেটের অসুখ সারিয়ে তোলে।
● মেঘালয় ও হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে পাওয়া যায়।

● চামড়ার রোগ সারায়।

● অ্যান্টিবায়োটিকের কাজ করে।
● পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর-পূর্বাঞ্চল, দক্ষিণ ভারতে পাওয়া যায়।

♣ তোমার বাড়ি ও স্কুলের আশেপাশে কী কী ভেষজ গাছ পাওয়া যায়, তার নাম ও উপকারিতা লেখো।

আয়ুর্বেদ চিকিৎসা– ভারতে প্রাচীনকাল থেকে ভেষজ উদ্ভিদের ব্যবহার চলে আসছে। এর উপর ভিত্তি করে যে চিকিৎসা পদ্ধতি গড়ে উঠেছে তার নাম আয়ুর্বেদ চিকিৎসা।

অরণ্য ও বন্যপ্রাণ

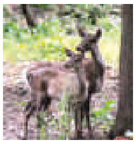

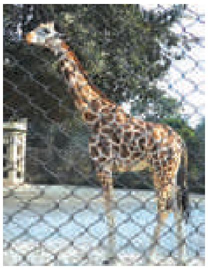

সুজয় মামার সাথে কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানায় গিয়ে খুব মজা পেয়েছিল। চিড়িয়াখানায় বাঘ, সিংহ, হাতি, গন্ডার, জেব্রা, জিরাফ, জলহস্তী, কুমির, নেকড়ে, শিম্পাঞ্জি-র পাশাপাশি আছে নানা ধরনের সাপ আর বিচিত্র পাখি! মামা বলেছিলেন— এই সব পশুপাখির মধ্যে কিছু আমাদের দেশের আর কিছু অন্যান্য দেশ থেকে আনা হয়েছে।

ভারতের বিভিন্ন জীবজন্তু বিভিন্ন রকম বন্য পরিবেশে দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, কুমির; গুজরাটের গির অরণ্যে সিংহ, কচ্ছের রানে বুনো গাধা দেখা যায়। আবার রাজস্থানের মরু অঞ্চলে উট, ময়ূর; দক্ষিণ ভারতে হাতি, হরিণ; হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে ভালুক, রেডপান্ডা, চিতা দেখা যায়। উত্তর- পূর্বাঞ্চলের ঘন অরণ্যে বিভিন্ন প্রজাতির বাঁদর, হাতি, একশৃঙ্গ গন্ডার, জলাজমিতে নানা ধরনের সাপ ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়। সারা ভারত জুড়েই বিভিন্ন প্রজাতির সুন্দর সুন্দর পাখি দেখা যায়।

শীতকালে শীতপ্রধান দেশ থেকে কিছু পাখি উড়ে আমাদের দেশে আসে। গরম পড়লে তারা আবার নিজের দেশে ফিরে যায়। এরা পরিযায়ী পাখি।

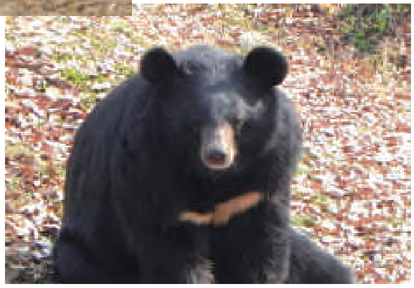

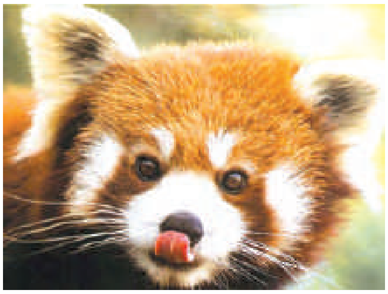

সুজয়ের মামা বলেছিলেন এই সব পশুপাখিদের চিড়িয়াখানাতে দেখার থেকে জঙ্গলে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখতে অনেক বেশি ভালো লাগে। সুজয় মনে মনে ভাবল সত্যিই তো! এখন পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই নির্বিচারে গাছপালা কেটে বন ফাঁকা করে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে বিভিন্ন প্রজাতির বন্যজন্তুর অস্তিত্ব বিপন্ন হচ্ছে। তাই এই অরণ্যগুলিকে বিভিন্নভাবে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

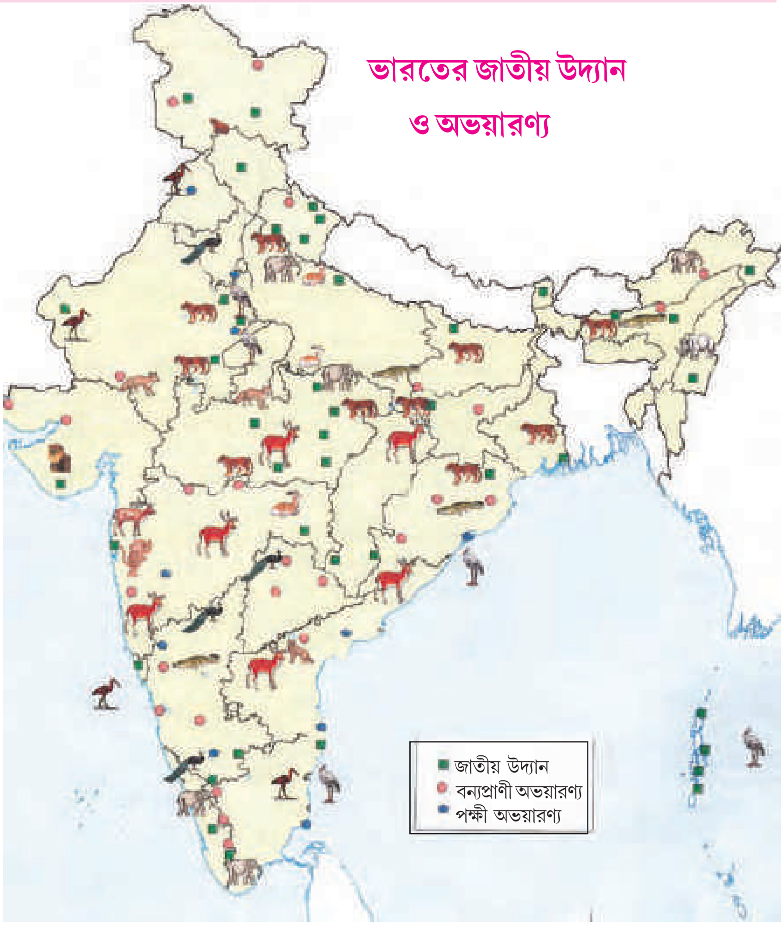

বিশেষ কথা

সংরক্ষিত অরণ্য (Reserved Forest): যেখানে শিকার, পশুচারণ ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ নিষিদ্ধ। যেমন- কোডার্মা সংরক্ষিত অরণ্য।

সুরক্ষিত অরণ্য (Protected Forest): যেখানে অরণ্যের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকা মানুষদের মাঝে মধ্যে শিকার ও পশুচারণের অধিকার দেওয়া হয়।

অভয়ারণ্য (Sanctuary): যেখানে লুপ্তপ্রায় প্রজাতির সুরক্ষা ও উন্নয়ন-এর দিকে লক্ষ রাখা হয়। যেমন--- জলদাপাড়া অভয়ারণ্য।

জাতীয় উদ্যান (National Park): যেখানে বন্যপ্রাণীর সাথে সাথে স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রক্ষার দিকেও নজর দেওয়া হয়। যেমন— কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান।

১৯৭২ সালে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন চালু হয়। প্রতি বছর অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহটি ভারতে 'বন্যপ্রাণ সপ্তাহ' হিসেবে পালিত হয়।

করবেট জাতীয় উদ্যান

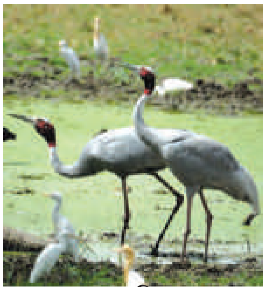
ঘানা পাখিরালয়

জলদাপাড়া অভয়ারণ্য

আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজ্যের অভয়ারণ্য ও জাতীয় উদ্যানের নাম সংগ্রহ কর।

ভারতের কৃষিকাজ

আমাদের দেশ একটি কৃষিভিত্তিক দেশ। দেশের প্রায় ৬৫% মানুষ কোনো না কোনো

ভাবে কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত। ভারতের কৃষিকাজ অনেকাংশেই মৌসুমি বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীল। তবে এই বৃষ্টি অনিয়মিত বলে জলসেচের সাহায্যে চাষ করা হয়।

ভারতে উৎপাদিত ফসল

খাদ্য ফসল— ধান, গম, মিলেট।
সবজি ফসল— আলু, পটল, বেগুন।
তন্তুজাতীয় ফসল— তুলো, পাট।
পানীয় ফসল— চা, কফি।
অন্যান্য ফসল— ডাল, তৈলবীজ, রবার।

বিশেষ পদ্ধতিতে চাষ

➢ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আদিবাসী মানুষ বন কেটে ও পুড়িয়ে আলু, সবজির চাষ করে। কিছু বছর বাদে মাটির উর্বরতা কমে গেলে তারা অন্যত্র চলে যায়। এর নাম ঝুমচাষ।

➢ পাহাড়ি অঞ্চলে মাটির ক্ষয় রোধে ঢালু জমিতে ধাপ কেটে যে চাষ হয় তাকে কী বলে?

তুমি কখনও কি চাষের জমি দেখেছ?

➢ চাষের জমিটা কি উর্বর?
➢ জলনিকাশি ব্যবস্থা কেমন?
➢ বার্ষিক গড় উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কত?
➢ জমিতে কি কোনো সার, কীটনাশক ব্যবহার করা হয়?
➢ জলসেচ দরকার হয় কি?
➢ বছরের কোন কোন সময়ে কী কী ফসল চাষ হয়?
➢ ফসলগুলো বিক্রির বাজারটা জমি থেকে কত দূরে?
➢ যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা কেমন?
➢ উৎপন্ন ফসল সংরক্ষণ করে রাখার কি কোনো ব্যবস্থা আছে?
➢ চাষের জমিতে কতজন কাজ করেন?

জানো কী?

ষাটের দশকের শেষে ভারতের কৃষিতে বিরাট পরিবর্তন আসে। উচ্চফলনশীল বীজ, সার, জলসেচ ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারে উৎপাদন বহুগুণে বেড়ে যায়, যা ‘সবুজ বিপ্লব’ নামে পরিচিত।

কৃষিজ ফসল	জলবায়ু		মাটি	উৎপাদক রাজ্য
	উষ্ণতা (°সে.)	বৃষ্টিপাত (সেমি)		
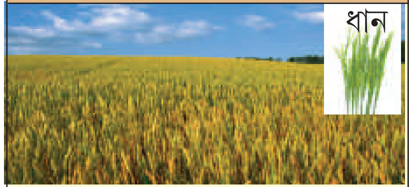	২২-৩২	১৫০-৩০০	পলিযুক্ত দোয়াঁশ মাটি। জমিতে জল দাঁড়িয়ে থাকা প্রয়োজন।	পশ্চিমবঙ্গ, অসম, বিহার, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক।
	১৫-২০	৫০-১০০	উন্নত জলনিকাশি ব্যবস্থা সহ চুনযুক্ত দোয়াঁশ মাটি।	উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, বিহার, পাঞ্জাব, ওড়িশা, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, জম্মু ও কাশ্মীর।
জোয়ার 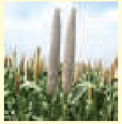 বাজরা 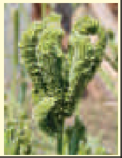 রাগি	জোয়ার :২৭-৩২ বাজরা : ২৫-২৮ রাগি : ২৭-৩২	জোয়ার : ৩০-১০০ বাজরা : ৪০-৫০ রাগি : ৩৫-৬০	বেলে মাটি ও বেলে দোঁয়াশ মাটি।	জোয়ার: মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ। বাজরা : রাজস্থান, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ। রাগি: কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ।
	২০-৩০	৫০-৭৫	দোয়াঁশ মাটি ও কালো মাটি।	ভারতের সমস্ত রাজ্য বিশেষত উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ।

কৃষিজ ফসল	জলবায়ু		মাটি	উৎপাদক রাজ্য
	উষ্ণতা (°সে.)	বৃষ্টিপাত (সেমি)		
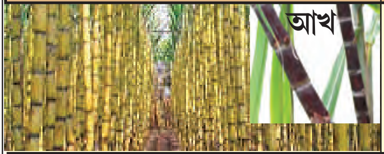	২৫-৩০	১০০-১৫০	উন্নত জলনিকাশি ব্যবস্থা-যুক্ত নাইট্রোজেন ও পটাশ সমৃদ্ধ দোয়াঁশ মাটি।	উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু।
	২৮-৩৬	১৫০-২০০	পলিযুক্ত কাদা মাটি ও দোয়াঁশ মাটি।	পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা।
	২০-৩৫	৫০-১০০	উন্নত জলনিকাশি ব্যবস্থা-সম্পন্ন চুন ও ফসফেট যুক্ত কালো মাটি।	মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব, হরিয়ানা।
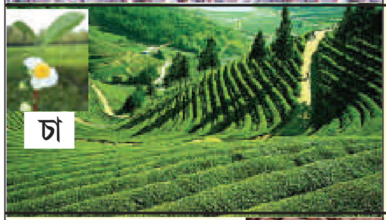	২০-৩০	১৫০-২০০	উন্নত জলনিকাশি ব্যবস্থা যুক্ত ঢালুজমি, হিউমাস ও জলযুক্ত দোয়াঁশ মাটি।	অসম, পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক, কেরালা, তামিলনাড়ু।
	১৮-২৮	১৫০-২০০	উন্নত জলনিকাশি ব্যবস্থা সম্পন্ন হিউমাস।	কর্ণাটক, কেরালা, তামিলনাড়ু।

উত্তরগুলি খুঁজে বের করে লেখার চেষ্টা করো—

গরমকাল : ____________ ✱ শীতকাল : কমলালেবু

পার্বত্য নাতিশীতোষ্ণ অরণ্য : পাইন ✱ ____________ : সেগুন

চা চাষ : ঢালু জমি ✱ ধান চাষ : ____________

কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান : গন্ডার ✱ গির জাতীয় উদ্যান : ____________

ম্যানগ্রোভ : পশ্চিমবঙ্গ ✱ পার্বত্য নাতিশীতোষ্ণ অরণ্য : ____________

উচ্চরক্তচাপ : ____________ ✱ ম্যালেরিয়া : সিঙ্কোনা

পলি মাটি : ____________ ✱ কালো মাটি : তুলো

শব্দছক-সমাধান

পাশাপাশি :

১. দক্ষিণ ভারতের শৈল শহর

২. পর্ণমোচী বৃক্ষ

৩. যে রাজ্যে প্রচুর বাঁশ গাছ দেখা যায়

৪. নদীর ধারের পলিমাটি যে কারণে সৃষ্টি হয়

উপর-নীচ :

৫. পশ্চিমবঙ্গের অভয়ারণ্য যেখানে গন্ডার দেখা যায়

৬. গ্রীষ্মকালীন বিকেলের ঝড়

৭. যে রাজ্যে বছরে দুবার বৃষ্টি হয়

৮. পৃথিবীর সর্বাধিক বৃষ্টিযুক্ত স্থান

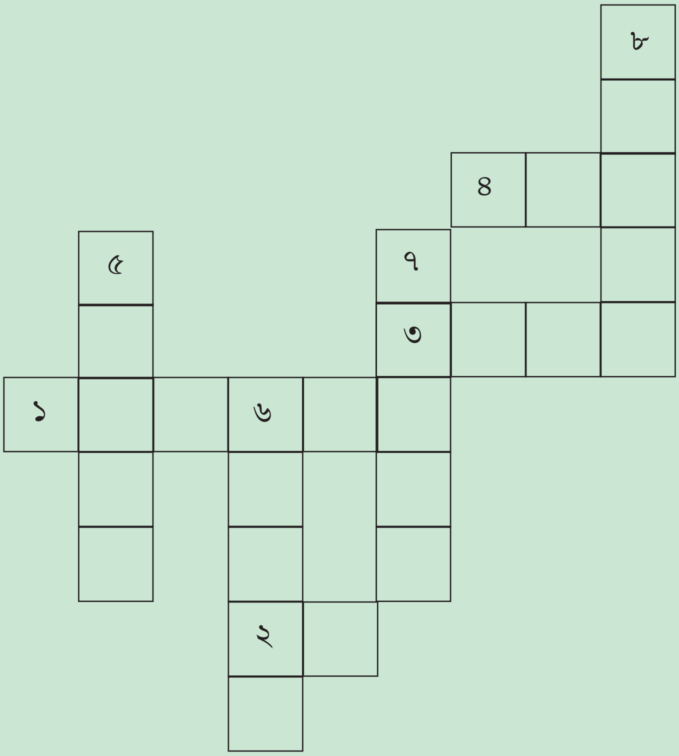

কৃষিকাজের প্রয়োজনীয় উপাদানের ছবি দেখে লেখার সঙ্গে মিলিয়ে ছবির নীচে সঠিক নম্বর বসাও

১) ভূমির ঢাল
২) শ্রমিক
৩) জলনিকাশ
৪) মাটি
৫) সার
৬) কীটনাশক
৭) ব্যবসা-বাণিজ্য
৮) প্রযুক্তি
৯) রক্ষণাগার
১০) বাজার
১১) জলসেচ
১২) মূলধন
১৩) উচ্চফলনশীল বীজ
১৪) পরিবহণ

মেলাও দেখি—

বামদিক	ডানদিক
(১) বৃক্ষচ্ছেদন	(১) চা
(২) পশ্চিমি ঝঞ্ঝা	(২) কাজিরাঙা
(৩) জাতীয় উদ্যান	(৩) বাসক পাতার রস
(৪) বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল	(৪) রাজস্থানের জয়সলমীর
(৫) চরমভাবাপন্ন জলবায়ু	(৫) মাটির ক্ষয়কে বাড়িয়ে দেয়
(৬) সর্দি-কাশিকে কমিয়ে দেয়	(৬) পশ্চিমঘাট পর্বতের পূর্বঢাল
(৭) পার্বত্য অঞ্চলের ঢালু জমির ফসল	(৭) শীতকালে কাশ্মীরে প্রবল তুষারপাত হয়

ভারতের জনজাতি

ওর নাম ডমরু। ডমরু থাকে আমাদের রাজ্যের পশ্চিমের জেলা পুরুলিয়াতে। ডমরু বয়সে ছোটো কিন্তু খুব সাহসী। ডমরুর হাতে কিছু দেখতে পাচ্ছ? ওগুলো তির আর ধনুক। ডমরু শিকার করতে খুব ওস্তাদ। ডমরুরা মাটির বাড়িতে থাকে। জঙ্গলের ধারে ওদের গ্রাম। আগে ডমরুর দাদুরা জঙ্গলে শিকার করত, ফলমূল খুঁজে আনত। এখন জীবন অনেক পালটে গেছে। গ্রামের জোয়ানরা এখ ন ক্ষেতে, কলকারখানায় কাজ করে। কয়েকজন তো পড়াশোনা করে শহরে চাকরিও করছে। ডমরুও স্কুলে যায়।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝেছ যে ডমরু একজন আদিবাসী ছেলে। আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করে এমন অনেক জনগোষ্ঠী আছে। কোথায় থাকে ওরা, ওদের জীবনযাত্রাই বা কেমন? এসো জেনে নেওয়া যাক।

ভারতের আদি জনগোষ্ঠী

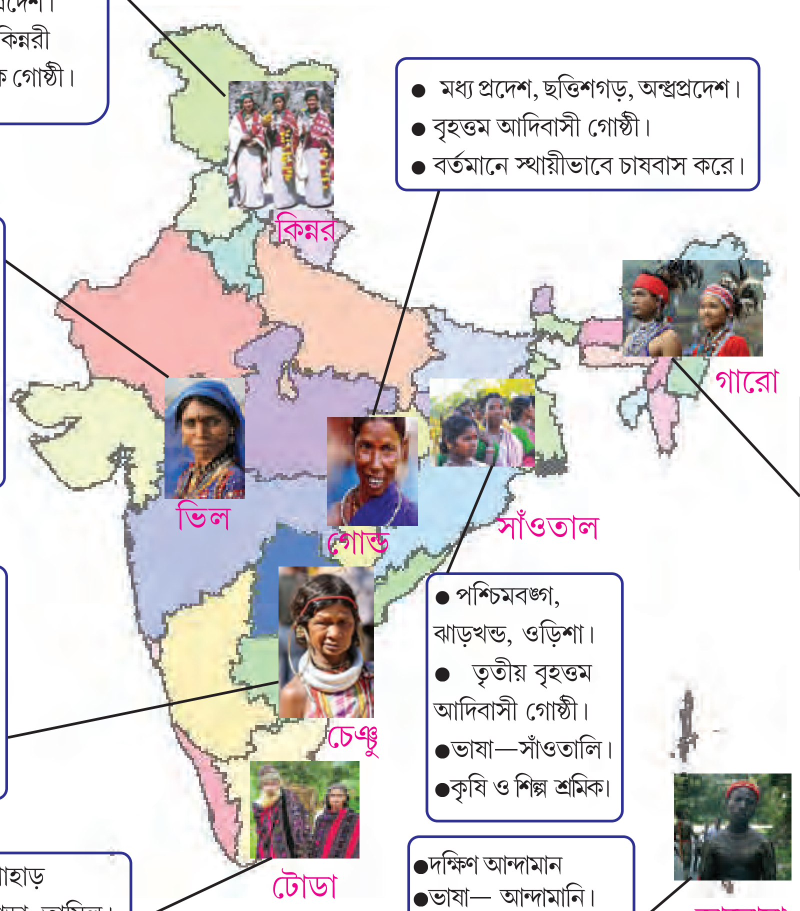

- হিমাচল প্রদেশ।
- ভাষা— কিন্নরী
- পশুপালক গোষ্ঠী।

- মধ্য প্রদেশ, ছত্তিশগড়, অন্ধ্রপ্রদেশ।
- বৃহত্তম আদিবাসী গোষ্ঠী।
- বর্তমানে স্থায়ীভাবে চাষবাস করে।

- মধ্য প্রদেশ, গুজরাট, রাজস্থান।
- ভাষা— ভিলি
- দ্বিতীয় বৃহত্তম আদিবাসী গোষ্ঠী।
- বর্তমানে চাষবাস প্রধান জীবিকা।

- মেঘালয়ের গারো পাহাড়।
- ভাষা—গারো।
- অস্থায়ী কৃষিজীবী, শিকার, মাছ ধরা।

- অন্ধ্রপ্রদেশ।
- ভাষা— চেঞ্চু, তেলুগু।
- শিকার ও ফলমূল সংগ্রহ প্রধান জীবিকা।

- পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খন্ড, ওড়িশা।
- তৃতীয় বৃহত্তম আদিবাসী গোষ্ঠী।
- ভাষা—সাঁওতালি।
- কৃষি ও শিল্প শ্রমিক।

- নীলগিরি পাহাড়
- ভাষা— টোডা, তামিল।
- পশুপালন প্রধান জীবিকা।

- দক্ষিণ আন্দামান
- ভাষা— আন্দামানি।
- শিকার ও ফলমূল সংগ্রহ প্রধান জীবিকা।

আদিবাসী কারা?

বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠী, যারা প্রাচীনকাল থেকে শিকার, পশুপালন, ফলমূল সংগ্রহ করে জীবনযাপন করে আসছে। যাদের জীবনযাত্রা সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল।

এরকম আরো অনেক জনগোষ্ঠী আমাদের দেশে বাস করে। এঁদের সম্বন্ধে জেনে ক্লাসে বন্ধুদের সাথে আলোচনা করো।

কদিন আগে মুম্বাইয়ে কাকার কাছে গিয়েছিল রাজীব। শহরটা ভারতের পশ্চিমদিকে আরবসাগরের তীরে অবস্থিত। রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে রাজীব নানা ধরনের মানুষ দেখেছিল। ওখানকার মারাঠি ভাষা ও একেবারেই বুঝতে পারত না। রাজীব কাকার সাথে যখন সন্ধেবেলা সমুদ্রের ধারে বসত তখন মাঝে মাঝেই একদল মানুষ গিটার বাজিয়ে খুব সুন্দর গান গাইত। কাকার পাঞ্জাবি ড্রাইভার বলল ওরা গোয়ানিজ। গোয়া নামে ছোট্ট রাজ্যটিতে ওদের বাস। রাতে ওরা একটা হোটেলে খেতে যেত। যেখানে রাজীব প্রায়ই দেখত কয়েকটা ছেলে অপরিচিত ভাষায় কথা বলতে বলতে খায়। ওরা তামিল। তামিলনাড়ু থেকে এসে ওরা মুম্বাই-এ সিনেমা শিল্পে কাজ করে। রাজীব ওই নানা ধরনের মানুষদের কথা ভাবত। সকলেরই ভাষা, চেহারা, খাবার-দাবার, পোশাক অনেকটাই আলাদা।

আসলে আমাদের দেশের বড়ো বড়ো শহরগুলো এক একটা সমগ্র ভারতের ক্ষুদ্র রূপ। কাজের খোঁজে নানান প্রয়োজনে নানা প্রদেশের লোক সেখানে এসে ভিড় জমায়। মুম্বাইয়ে গিয়ে রাজীবের এই রকম একটা ছোট্টো ভারতের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।

চেষ্টা করে দেখো—

- এমন তিনটি রাজ্যের নাম লেখো যাদের নামের সাথে ভাষার নামের মিল আছে।
- এমন তিনটি রাজ্যের নাম লেখো যাদের নামের সাথে ভাষার নামের মিল নেই।
- পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া ভারতের আর কোন রাজ্যের প্রধান ভাষা বাংলা?

বন্ধুরা মিলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জীবন যাত্রা নিয়ে নাটিকা তৈরি করে অভিনয় করো।

ভারতের অধিবাসী

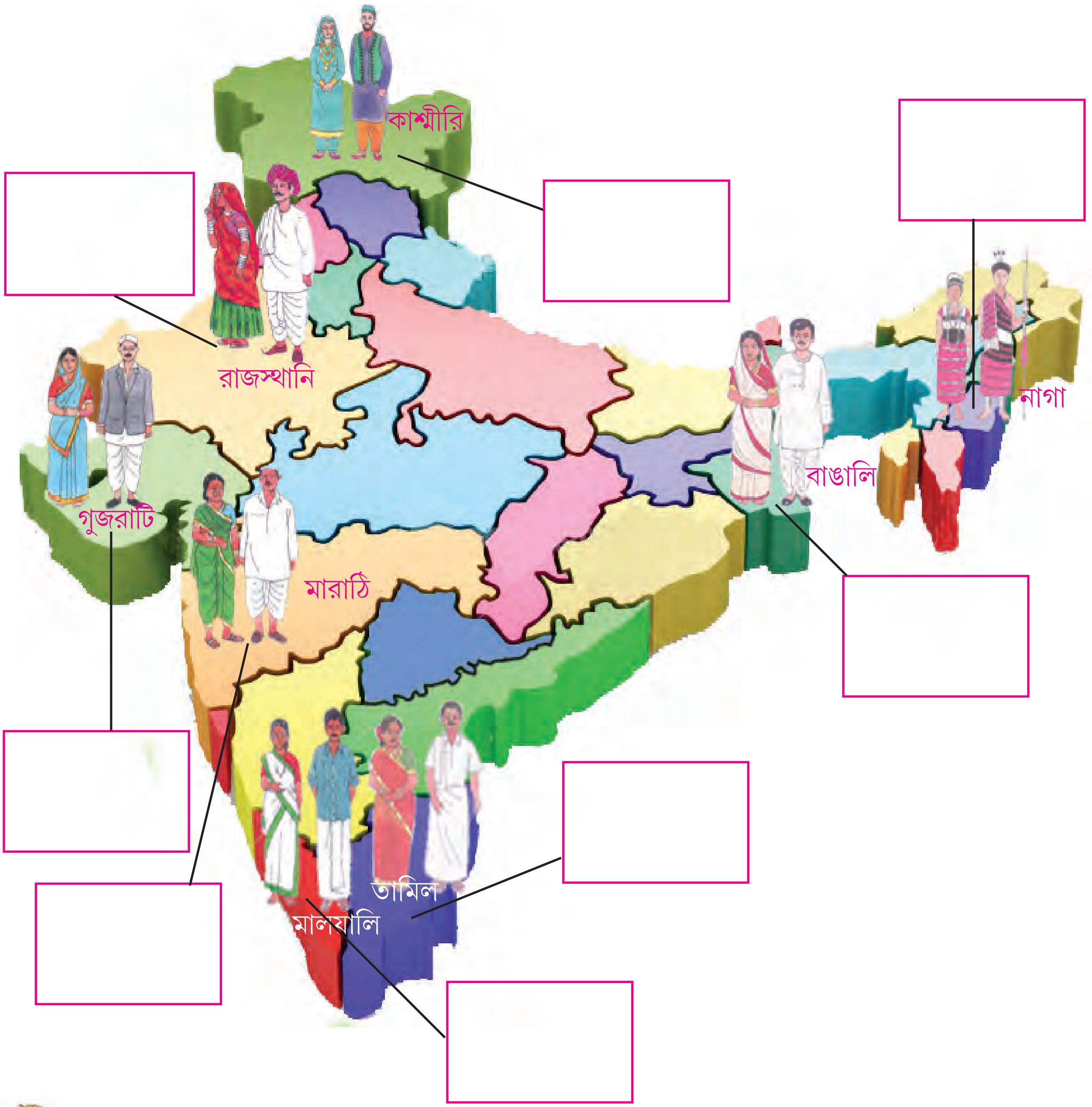

ভারতের অধিবাসীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে ফাঁকা ঘরগুলোতে লিখে ফেলো।

- **আমাদের রাজ্যে বিভিন্ন প্রান্তে নানা উৎসব, আঞ্চলিক নাচ-গান, লোক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য আছে। তুমি তোমার অঞ্চলের কোনো বিশেষ ঐতিহ্য সম্পর্কে তথ্য ও ছবি সংগ্রহ করো।**

ভারতের জাতীয় দিবস

১৫-ই আগস্ট
স্বাধীনতা দিবস

২রা অক্টোবর
গান্ধি জয়ন্তী

২৬ শে জানুয়ারি
সাধারণতন্ত্র দিবস

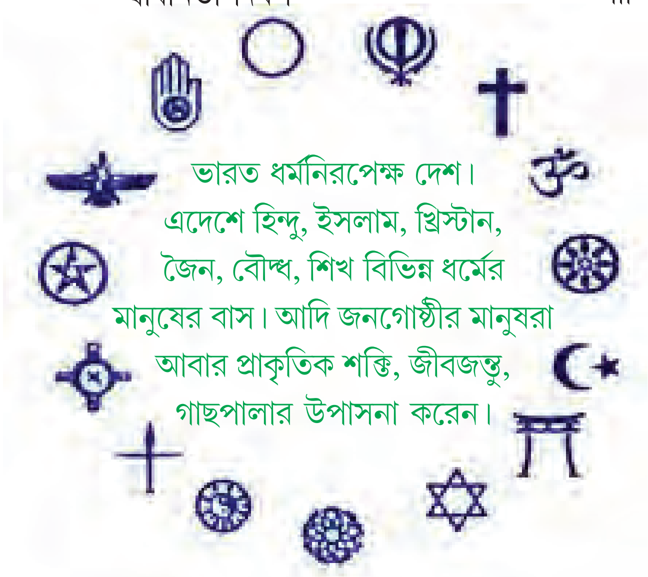

ভারত ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। এদেশে হিন্দু, ইসলাম, খ্রিস্টান, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ বিভিন্ন ধর্মের মানুষের বাস। আদি জনগোষ্ঠীর মানুষরা আবার প্রাকৃতিক শক্তি, জীবজন্তু, গাছপালার উপাসনা করেন।

ভারতের ধর্মীয় উৎসব

হিন্দু—দীপাবলি, হোলি।
ইসলাম—ইদ-উল-ফিতর, মহরম।
খ্রিস্টান—গুড ফ্রাইডে, বড়োদিন।
জৈন—মহাবীর জয়ন্তী।
বৌদ্ধ—বুদ্ধ পূর্ণিমা।
শিখ—গুরুনানক জয়ন্তী।

‘নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান
বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান’ —

তাই ভাষা, ধর্ম, ঐতিহ্যে নানা পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমাদের একসাথে বেঁধে রেখেছে দেশের প্রতি আমাদের ভালোবাসা এবং জাতীয়তাবোধ।

বৈচিত্র্য অনেক হলেও আমরা কিন্তু এক

এটা আমাদের একটা খুব গৌরবের ছবি। ২০১১ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় দল। ভেবে দেখো এই দলের ক্যাপ্টেন ধোনি ঝাড়খণ্ডের, শচীন আর জাহির মহারাষ্ট্রের, শেহবাগ আর গম্ভীর দিল্লির, যুবরাজ আর হরভজন পাঞ্জাবের।

কিন্তু সবার পরিচয় একটাই— সবাই ভারতীয়। এদের জয়ে সব রাজ্যের সব ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতির মানুষ সমানভাবে খুশি, আনন্দিত। আমরা যে যেখানেই থাকি না কেন, যে যা কাজ করি না কেন আমাদের প্রথম ও প্রধান পরিচয় আমরা ভারতবাসী। বিশ্ব দরবারে সাহিত্য, বিজ্ঞান, খেলাধূলা, বিনোদনে যখন কোনো ভারতীয়, দেশের মাথা উঁচু করে তখন গর্বে আমাদের বুক ভরে যায়। তেমনি দেশের কোনো প্রান্তে যখন কোনো বিপর্যয় ঘটে তখন আমরা সবাই উৎকণ্ঠিত হই। আবার আমরা একসাথে সকল উৎসবে সামিল হই।

মানচিত্র

সেবার টুবলুরা বেড়াতে গেল একটা ছোট্ট শহরে। অচেনা জায়গা, মেঘলা আকাশ, একটু পরেই বৃষ্টি শুরু হবে ... এর মধ্যে রাস্তা হারিয়ে গেল। অনেক খুঁজে একজনকে পাওয়া গেল।

আকাশে মেঘ। সূর্য কোনদিকে তা বোঝা যাচ্ছে না ..... !

বলো তো! কি থাকলে, ওই অচেনা জায়গার রেল স্টেশন, বাজার, স্কুল, বড়ো রাস্তা কোথায়, কোন দিকে আছে, ওরা খুব সহজেই বুঝতে পারত?

—উত্তরটা হবে ওই এলাকার **মানচিত্র বা ম্যাপ**।

রহিমের আঁকা ছবি

অর্কর আঁকা ছবি

- রহিম আর অর্কদের বাড়ির সামনে একটা সুন্দর পার্ক আছে। ওরা দুজনেই পার্কটির ছবি এঁকেছে। লক্ষ করে দেখো ছবি দুটোর মধ্যে কী কী মিল অথবা অমিল আছে?

দেখোতো কোন ছবিটা থেকে জায়গাটার কোথায় কী আছে, বেশি ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে?

ওদের মতো, তুমিও তোমার বাড়ি অথবা স্কুল-এর আশেপাশের একটা ছবি আঁকার চেষ্টা করে দেখো। এবার এইভাবে যদি তোমার শহর বা গ্রাম, জেলা বা রাজ্যের একটি ছবি আঁকার চেষ্টা করো; তাহলে কী হবে? পুরো রাজ্য বা জেলাকে একসঙ্গে একটা ছবির মধ্যে দেখাতে গেলে সব বিষয় বা তথ্য নিখুঁতভাবে দেখাতে পারবে না। তাহলে উপায়?

— একমাত্র মানচিত্র বা ম্যাপ-এর মাধ্যমেই পৃথিবীর যে-কোনো অংশের অথবা সমগ্র পৃথিবীর সঠিক উপস্থাপন করা যায়।

- মানচিত্রে বিভিন্ন ধরনের তথ্য, বিষয় উপস্থাপন করা যায়। যে সব মানচিত্রে প্রাকৃতিক বিষয় (পর্বত, মালভূমি, সমভূমি, নদ-নদী, স্বাভাবিক উদ্ভিদ) ইত্যাদি দেখানো হয়, সেগুলো **প্রাকৃতিক মানচিত্র**। আবার **রাজনৈতিক মানচিত্রে** দেশ, রাজ্য, জেলার অবস্থান; সীমানা ইত্যাদি দেখানো হয়। **বিষয়ভিত্তিক মানচিত্রে** নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক তথ্য থাকে। যেমন — আবহাওয়া মানচিত্র; জনসংখ্যা মানচিত্র; সড়কপথ, রেলপথ, খনিজ সম্পদ সংক্রান্ত মানচিত্র।

এই মানচিত্র থেকে একনজরে ভারতের প্রধান নদনদী সম্পর্কে জানা যায়। মানচিত্র না থাকলে এই সমস্ত নদনদীকে একসঙ্গে দেখানো সম্ভব হতো কি?

মানচিত্র বই থেকে তোমার রাজ্যের রাজনৈতিক মানচিত্র খুঁজে বার করো। তারপর ঠিকঠিক লিখে ফেলো—

- কতগুলো জেলা আছে?
- কোন জেলায় তুমি থাক?
- তোমার আশেপাশের জেলাগুলোর নাম কী?
- তোমার রাজ্যের রাজধানী কোনটা?

- আমাদের পৃথিবী এতই বিশাল যে একসঙ্গে পুরো পৃথিবীটা দেখা সম্ভব নয়। গ্লোব হলো পৃথিবীর একটা ছোট্ট মডেল বা প্রতিরূপ। গ্লোবের মাধ্যমে খুব সহজেই পৃথিবীর আকৃতি; দেশ, মহাদেশ, মহাসাগরগুলোর পারস্পরিক অবস্থান; আকৃতি সঠিকভাবে বোঝা যায়।

☞ **তোমার ক্লাসরুমে, স্কুলে, বাড়িতে গ্লোব থাকলে পর্যবেক্ষণ করো।**

- গ্লোবটা কীসের ওপর ঘোরে?
- গ্লোবের ওপর মহাদেশ মহাসাগরগুলো চিনতে পারছ? নিজের দেশটা কোথায় আছে, খুঁজে দেখো।
- গ্লোবের ওপর লম্বালম্বি ও আড়াআড়িভাবে টানা সরু রেখাগুলো কী?

বিশেষ কথা

- পৃথিবীর প্রাচীনতম মানচিত্রটি আবিষ্কৃত হয়েছে ব্যাবিলনে। খ্রিস্টজন্মের ২৫০০ বছর আগে, একটি পোড়ামাটির ফলক ওপর আঁকা হয়েছিল এই মানচিত্র।
- ষোড়শ শতাব্দীতে (১৫৭৮ সালে) ভূগোলবিদ মার্কেটর প্রথম মানচিত্র বই প্রকাশ করেন এবং গ্রিক পুরাণের দেবতা 'Atlas'-এর নামানুসারে নামকরণ করেন 'Atlas'। বর্তমানেও মানচিত্র বইকে 'Atlas' বলা হয়।

- ম্যাপ শব্দটার উৎপত্তি, ল্যাটিন শব্দ 'ম্যাপা' থেকে। যার অর্থ কাপড়। প্রাচীনকালে কাপড়, চামড়া, তুলোট কাগজের ওপর ম্যাপ আঁকা হতো।
- মানচিত্র অঙ্কন বিদ্যাকে বলা হয় **'কার্টোগ্রাফি' (Cartography)**।
- গ্লোব আর মানচিত্র ভূগোল শেখার অপরিহার্য উপাদান। এগুলোর মাধ্যমে সারা পৃথিবীর যে-কোনো অঞ্চল সম্বন্ধে তথ্য এবং ধারণা পাওয়া যায়। এখন ঘরে বসেই উপগ্রহ চিত্র থেকে কম্পিউটারের মাধ্যমে মানচিত্র তৈরি করা যায়।

- গ্লোব পৃথিবীর ক্ষুদ্র প্রতিরূপ হলেও, গ্লোব থেকে কোনো দেশ, মহাদেশ সম্বন্ধে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। আর গ্লোব সব সময় সব জায়গায় বয়ে নিয়ে যাওয়া অসুবিধাজনক।
- পৃথিবী সম্বন্ধে জানার আরও সহজ ও নির্দিষ্ট উপায় হলো মানচিত্র বা ম্যাপ।

কিন্তু গোলাকার পৃথিবীকে সমতল কাগজে আঁকার ব্যাপারটা বেশ কঠিন।

➤ একটা বল বা কমলালেবুকে কাগজ দিয়ে মুড়ে ফেলার চেষ্টা করে দেখো। লক্ষ করো কাগজে প্রচুর ভাঁজ পড়েছে। বল-এর উপরের এবং নীচের দিকটাতে কাগজটা সব থেকে বেশি কুঁচকে যাচ্ছে। সমতল কাগজে পৃথিবীর মানচিত্র আঁকতে গেলে ঠিক এই কারণেই অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়।

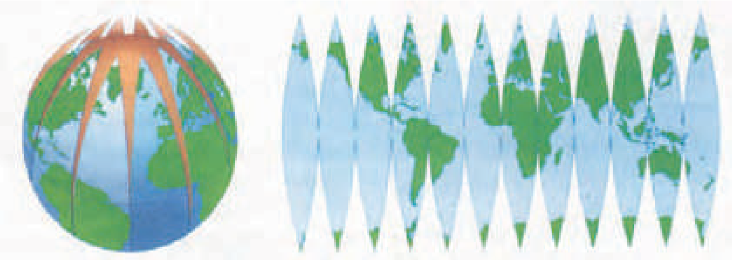

কল্পনা করো — একটা গ্লোবকে টুকরো করে কেটে সমতলে বিছিয়ে দেওয়া হলো। এইভাবে যেটা পাওয়া গেল, সেটা ত্রিমাত্রিক পৃথিবীর দ্বিমাত্রিক মানচিত্র!

➤ 'শুভ'র বাড়ি থেকে স্কুলে যাওয়ার রাস্তাটা এই মানচিত্রে দেখানো আছে। কিন্তু বাড়ি থেকে স্কুলটা কতটা দূরে? শুভ কি ১০ মিনিট হাঁটলেই স্কুলে পৌঁছে যায়, নাকি একঘণ্টা হাঁটতে হয়?

লক্ষ করো, মানচিত্রটির ডানদিকে একটা স্কেল আঁকা আছে। ওই স্কেলটা থেকেই কিন্তু এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়। কীভাবে?

বুঝেই দেখো

মানচিত্রে কোনো বিরাট অঞ্চলকে একনজরে দেখানোর জন্য বাস্তবের তুলনায় আকারে ছোটো করে দেখানো হয়। যে নির্দিষ্ট অনুপাতে পৃথিবীর দুটি স্থানের মধ্যে দূরত্বকে মানচিত্রে যে দূরত্বে দেখানো হয়, সেটাই হলো মানচিত্রের স্কেল।

‘শুভ’র বাড়ি (‘ক’) থেকে, হসপিটাল (‘খ’) পর্যন্ত দূরত্বটা তোমার স্কেল-এর সেন্টিমিটার-এর দিকটা দিয়ে মেপে দেখো, কত সেমি হয়। এবার বুঝতে হবে মানচিত্রের স্কেলটা কত? মানচিত্রের নীচের দিকে যে স্কেলটা আঁকা আছে, তাতে ১০০ মিটার দূরত্বকে ১ সেমিতে দেখানো আছে। এর অর্থ মানচিত্রে নির্দিষ্ট দুটো স্থানের মধ্যে দূরত্ব ১ সেমি হলে, বাস্তবে তাদের মধ্যে দূরত্ব (১ × ১০০ মিটার) = ১০০ মিটার।

অতএব ‘ক’ এবং ‘খ’-এর মধ্যে দূরত্ব ‘_____’ সেমি হলে, বাস্তবে দূরত্ব (‘_____’ × ১০০ মিটার) = ‘_____’ মিটার।

‘শুভ’ বাড়ি থেকে স্কুলে যেতে মোট (ক- খ), (খ - গ), এবং (গ - ঘ) দূরত্ব অতিক্রম করে। মানচিত্রে এই দূরত্বগুলো স্কেল দিয়ে মেপে, তারপর যোগ করে দেখো, কত সেমি হয়। এরপর মানচিত্রের স্কেল অনুযায়ী তাকে ১০০ মিটার দিয়ে গুণ করে দিলেই ‘শুভ’র বাড়ি থেকে স্কুলের বাস্তব দূরত্ব জানতে পেরে যাবে।

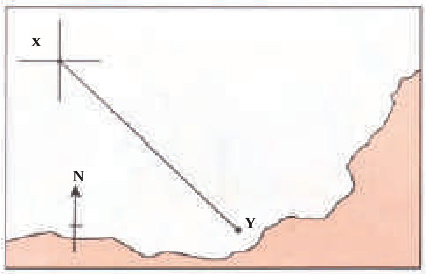

- এইভাবে যে-কোনো মানচিত্র থেকেই দুটো স্থানের মধ্যে বাস্তব দূরত্ব বের করে ফেলতে পারো। প্রথমে স্থানদুটোকে সরলরেখায় যোগ করে মানচিত্র দূরত্বকে মানচিত্র স্কেল-এর মান দিয়ে গুণ করলেই বাস্তব দূরত্ব পেয়ে যাবে!

জেনে রাখো!

- মানচিত্র দূরত্ব এবং বাস্তব দূরত্বের অনুপাত হলো স্কেল।
- যে সমস্ত মানচিত্রে বিরাট অঞ্চল দেখানো হয়, (পৃথিবী, মহাদেশ, দেশ-এর মানচিত্র) সেগুলো ‘ছোটো স্কেল মানচিত্র’। যেমন - ১ সেমি মানচিত্র দূরত্ব = ২৫০ কিমি বাস্তব দূরত্ব; এই স্কেলে আঁকা মানচিত্র **‘ছোটো স্কেল মানচিত্র’** (Small scale map)। এতে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না।
- যে সমস্ত মানচিত্রে কোনো ছোটো অঞ্চল, (গ্রাম, শহর-এর মানচিত্র) দেখানো হয়, সেগুলো ‘বড়ো স্কেল মানচিত্র’ (Large scale map)। যেমন - ১ সেমি মানচিত্র দূরত্ব = ২ কিমি বাস্তব দূরত্ব; এই স্কেলে আঁকা মানচিত্র **‘বড়ো স্কেল মানচিত্র’**। এতে অনেক বেশি বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়।

বুঝে নিয়ে লিখে ফেলো —

মানচিত্র দূরত্ব	বাস্তব দূরত্ব	স্কেল = মানচিত্র দূরত্ব / বাস্তব দূরত্ব
৫ সেমি	২৫ কিমি	১ সেমি = ৫ কিমি
১০ সেমি	১০০ কিমি	?
২ সেমি	?	১ সেমি = ৩০ মি

৬৬ নং পৃষ্ঠায় ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রটা ভালো করে লক্ষ করো। বলো তো ?

১. মানচিত্রটির স্কেল কত?

২. ভারতের উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্তের দূরত্ব কত ?

৩. মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী দিল্লি থেকে কলকাতা এবং মুম্বই থেকে চেন্নাই-এর বাস্তব দূরত্ব কত ?

পৃথিবীর মানচিত্রে আমাদের দেশকে ছোটো দেখায়। কিন্তু এশিয়ার মানচিত্রে বেশ বড়ো দেখায় কেন ?

➢ ‘শুভ’র বাড়ি থেকে স্কুলটা কত দূরে — সেটা জানা হলো। কিন্তু বাড়ি থেকে স্কুলটা কোনদিকে সেটা কীভাবে বোঝা যাবে ?

- লক্ষ করে দেখো, মানচিত্রের ডানদিকে, উপরে ‘N’ ↑ এরকম চিহ্ন আছে। এইরকম তিরচিহ্নের সাহায্যে উত্তরদিকটা (North) বোঝানো হয়।

উত্তরদিক কোনটা বোঝা গেলে, বাকি দিকগুলো (দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম) সবই খুব সহজেই বোঝা যায়। এই প্রধান চারটি দিক ছাড়াও, উত্তর এবং পূর্বদিকের মাঝখানে **উত্তর-পূর্ব(North-East)**, উত্তর এবং পশ্চিম দিকের মাঝখানে **উত্তর-পশ্চিম (North-West)**, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের মাঝখানে **দক্ষিণ-পশ্চিম (South-West)** এবং দক্ষিণ ও পূর্ব দিকের মাঝখানে **দক্ষিণ-পূর্ব (South-East)** দিক আছে।

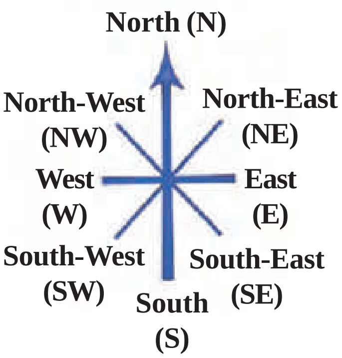

মানচিত্রে এরকম তিরচিহ্ন দিয়ে উত্তরদিক নির্দেশ করা না থাকলে, মানচিত্রের উপরের দিকটাকে উত্তরদিক ধরে নিতে হয়। এইভাবে, তোমার ডানদিকটা হবে মানচিত্রের পূর্বদিক, বাম দিকটা হবে মানচিত্রের পশ্চিম দিক। আর নীচের দিকটা দক্ষিণ দিক।

- সকালে সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে সহজেই দিক নির্ণয় করা যায়।

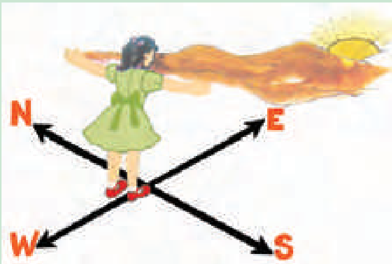

- কম্পাসের মাধ্যমে সঠিক ভাবে দিক নির্ণয় করা সম্ভব। কম্পাসে চুম্বকের কাঁটা সবসময় উত্তরদিক নির্দেশ করে। রাতের আকাশে ধ্রুবতারাকে দেখেও উত্তরদিক নির্ণয়

কোনো স্থানের সঠিক অবস্থান নির্ণয়ের জন্য ‘দূরত্ব’ এবং ‘দিক’ দুটোই অপরিহার্য।

‘অতএব শুভর বাড়ি থেকে স্কুলটা ____ দিকে ____ মিটার দূরে অবস্থিত’। এইভাবে বললে, তবেই স্কুল-এর অবস্থান সঠিকভাবে বোঝা যাবে।

ঠিক ঠিক লিখে ফেলো!

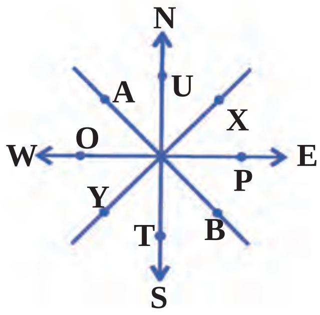

সূত্র : B-এর উত্তর-পশ্চিমে A অবস্থিত।

T-এর ___?___ U অবস্থিত।

O-এর ___?___ P অবস্থিত।

X-এর দক্ষিণ-পশ্চিমে ?___ অবস্থিত।

সকালবেলা সূর্য ওঠার সময়, বাড়ির ছাদ বা উঠোনে দাঁড়িয়ে, আশেপাশের বাড়িগুলো কোনদিকে আছে লক্ষ করে দেখো।

তোমার বাড়ি থেকে স্কুলে যাওয়ার পথটার একটা স্কেচ এঁকে ফেলো।

- ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রটা লক্ষ করো। দেখোতো, দিল্লি থেকে এই শহরগুলো কোনদিকে অবস্থিত?

১. কলকাতা ____, ২. মুম্বাই ____, ৩. চেন্নাই ____, ৪. বেঙ্গালুরু ____ ।

- মানচিত্রে যখন কোনো বড়ো অঞ্চলকে ছোটো করে আঁকা হয় তখন অল্প জায়গায় সব কিছু দেখাতে গেলে কিছু সংকেত, চিহ্ন, প্রতীক ব্যবহার করতে হয়।

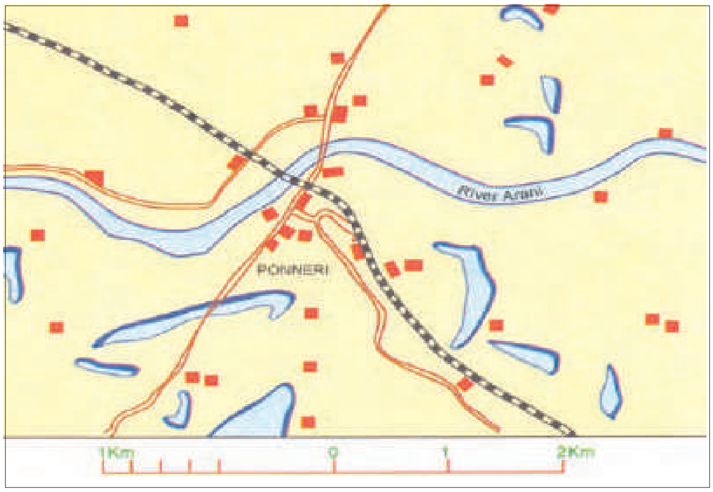

- লক্ষ করে দেখো, মানচিত্রটায় অনেকরকম চিহ্ন, সংকেত, অক্ষর, রং আছে। এগুলোর অর্থ কী কিছুই বোঝা যাচ্ছে না তো? পাশের সারণিতে কিছু প্রতীকচিহ্ন এবং তার অর্থ দেওয়া আছে। সারণির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে সহজেই বুঝতে পারবে অঞ্চলটার কোথায় কী আছে।

- পৃথিবীর সমস্ত দেশের মানচিত্রে কিছু নির্দিষ্ট রং, চিহ্ন, সংকেত, প্রতীক, অক্ষর একই অর্থে ব্যবহার করা হয়। এই সমস্ত নির্দিষ্ট প্রতীক চিহ্নকে প্রচলিত বা প্রথাগত প্রতীক চিহ্ন (Conventional Signs & Symbols) বলা হয়।

যেমন — জল বোঝাতে নীল রং, সমভূমি বা বনভূমির জন্য সবুজ রং, পাহাড়-পর্বতের জন্য খয়েরি বা বাদামি রং, কৃষিজমির জন্য হলুদ রং।

বিষয়ভিত্তিক মানচিত্রেও নির্দিষ্ট প্রয়োজনে অনেকরকম রং, চিহ্ন, সংকেত, অক্ষর ব্যবহার করা হয়। মানচিত্রের পাশে 'নির্দেশিকায়' (Index) ওই নির্দিষ্ট প্রতীক চিহ্ন, রং-এর অর্থ লেখা থাকে।

হাতে কলমে

তোমার বাড়ি থেকে স্কুলে যাওয়ার পথটার যে স্কেচ এঁকেছ, তাতে এরকম কিছু চিহ্ন, রং, প্রতীক ব্যবহার করে দেখো যেমন — খেলার মাঠ, পার্ক সবুজ রং! পুকুর বা জলাশয়ে নীল রং! ঘরবাড়ির জন্য লাল রং ইত্যাদি। এছাড়া মন্দির, রেল স্টেশন, পোস্ট অফিস ইত্যাদির জন্য ঐ সারণি থেকে নির্দিষ্ট প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করতে পারো। সবশেষে কোন কোন রং, চিহ্ন দিয়ে কী কী দেখালে তা বোঝাবার জন্য একটা নির্দেশিকা তৈরি করে ফেলো।

যেকোনো মানচিত্রেই অসংখ্য রকমের তথ্য দেওয়া থাকে (যেমন — দূরত্ব, নির্দিষ্ট দিক, বিভিন্ন প্রতীক চিহ্ন, অক্ষর, রং -এর মাধ্যমে দেখানো বিষয়বস্তু ইত্যাদি)। মানচিত্রকে ঠিকভাবে পড়তে পারলে তবেই মানচিত্রে দেখানো নির্দিষ্ট অঞ্চল বা বিষয়টি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

মানচিত্রের অপরিহার্য উপাদান

শিরোনাম	উত্তর দিক দেখানো তীর চিহ্ন	স্কেল	নির্দেশিকা
মানচিত্রের বিষয়বস্তুর ধারণা দেয়।	দিক নির্ণয় করা যায়।	মানচিত্রের নির্দিষ্ট দুটো স্থানের মধ্যে স্থানের দূরত্ব জানা যায়।	মানচিত্রে ব্যবহৃত প্রতীকচিহ্ন, রং অক্ষরের অর্থ বোঝা যায়।

জানো কী?

গ্লোব বা মানচিত্র ছাড়াও স্কেচ বা প্ল্যান -এর মাধ্যমেও কোনো অঞ্চল বা জায়গা সম্বন্ধে কিছু সাধারণ ধারণা পাওয়া যায়। 'অর্ক'র আঁকা পার্ক এর ছবি, 'শুভ'র স্কুলের পথের ছবিটা— আসলে স্কেচ। স্কেল অনুযায়ী আঁকা হয় না বলে স্কেচ থেকে দূরত্ব বা দিক সঠিকভাবে বোঝা যায় না।

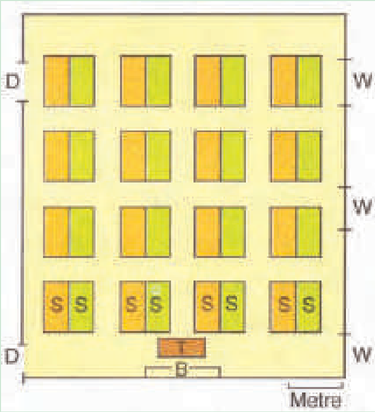

- খুব ছোটো জায়গা, যেমন বাড়ি, স্কুল, একটা ঘর, বা ক্লাসরুমকে নিখুঁতভাবে দেখাতে গেলে 'প্ল্যান' আঁকতে হয়। সঠিকভাবে মাপজোখ করে নির্দিষ্ট স্কেল অনুযায়ী 'প্ল্যান' আঁকা হয়। ফলে 'প্ল্যান' থেকে 'দূরত্ব' এবং 'দিক' দুটোই সঠিকভাবে বোঝা যায়।

মজার খেলা

- মনে মনে একটা সুন্দর জায়গা কল্পনা করো, যেখানে তুমি বেড়াতে যেতে চাও। জায়গাটার কোনদিকে কী কী আছে তা প্রতীক চিহ্ন, রং ব্যবহার করে এঁকে ফেলো। এবার বন্ধুদেরকে দেখাও। তোমার কল্পনায় দেখা জায়গাটা, তারা কতটা বুঝতে পারল জেনে দেখো। এইভাবে ওদের আঁকা কল্পনার জায়গাটা তুমিও বুঝতে পারো কিনা দেখো!!

- বন্ধুরা মিলে দুটো দল বানাও। একদল 'গ্লোব', আর অন্য দল 'মানচিত্র'। এবার গ্লোব বা মানচিত্র কোনটার কী সুবিধা বা অসুবিধা তা আলোচনা করো।

টুকরো খবর

ওপরের খবরগুলো তোমার বইয়ের কোন কোন অধ্যায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত তা তোমার পাতায় লিখে ফেলো।

- তুমিও এরকম টুকরো খবর সংগ্রহ করে তোমার পাতায় কোলাজ তৈরি করো।

তোমার পাতা

তোমার পাতা

ষষ্ঠ শ্রেণি

নমুনা প্রশ্নপত্র

১। [বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)]

সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো :—

(ক) পৃথিবীর আবর্তনের গতিবেগ সবচেয়ে বেশি—

কর্কটক্রান্তিরেখায়/সুমেরুবৃত্তরেখায়/নিরক্ষরেখায় /কুমেরু বিন্দুতে।

(খ) সিঙ্কোনা গাছ জন্মায় পশ্চিমবঙ্গের প্রধানত —

হুগলি/বর্ধমান/পশ্চিম মেদিনীপুর/দার্জিলিং জেলায়।

২। [নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন/অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)]

(i) শূন্যস্থান পূরণ করো :—

(ক) ______________ হলো সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহাণু।

(খ) মালাবার উপকূলের উপহ্রদগুলোকে______________ বলে।

(ii) স্তম্ভ মেলাও :—

বামদিক	ডানদিক
পৃথিবীর প্রকৃত আকৃতি	ব্যারোমিটার
বায়ুর চাপ	কার্টোগ্রাফি
মানচিত্র অঙ্কন বিদ্যা	জিওড

(iii) শুদ্ধ/অশুদ্ধ লেখো : —

(ক) চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদের ওপর পৃথিবীর গোলাকার ছায়া পড়ে।

(খ) মেঘালয় রাজ্যের চেরাপুঞ্জিতে প্রচুর মাটি ক্ষয় হতে দেখা যায়।

(iv) এক কথায় উত্তর দাও :—

(ক) মহাকাশ থেকে পৃথিবীকে কী রঙের দেখায়?

(খ) ভারতের একটি পশ্চিমবাহিনী নদীর নাম লেখো।

৩। [সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ২)]

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (অনধিক দু-তিনটি বাক্য) :—

(ক) নিরক্ষীয়তল বলতে কী বোঝ?

(খ) ‘কালবৈশাখী’র সময় আবহাওয়ার কীরূপ পরিবর্তন হতে দেখা যায়?

৪। [সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ৩)]

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (অনধিক পাঁচটি বাক্য) :—

(ক) আপাতভাবে পৃথিবীকে সমতল বলে মনে হয় কেন?

(খ) ভারতে শীতকাল ও গ্রীষ্মকালের জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্যের তুলনা করো।

(গ) নক্ষত্র ও গ্রহের পার্থক্য করো।

৫। [ব্যাখ্যামূলক উত্তরভিত্তিক (প্রতিটি প্রশ্নের মান ৫)]

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও (অনধিক দশটি বাক্য) :—

(ক) মহাদেশ সঞ্চরণের ধারণা দাও।

(খ) আন্টার্কটিকা মহাদেশে অভিযান করলে তুমি কী ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্মুখীন হবে?

(গ) ভারতে কী ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশ ধান উৎপাদনের পক্ষে অনুকূল? ধান উৎপাদিত হয় ভারতের এমন চারটি রাজ্যের নাম করো। (৩ + ২ = ৫)

৬। ভারতের রেখা মানচিত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো প্রতীক ও চিহ্নসহ বসাও (প্রতিটির মান ১)।

(ক) কর্কটক্রান্তিরেখা (খ) কারাকোরাম পর্বত (গ) গোদাবরী নদী (ঘ) কালো মাটি অঞ্চল (ঙ) পাট উৎপাদক অঞ্চল।

ওপরের নমুনা ছাড়াও অন্যান্য ধরনের প্রশ্ন দেওয়া যেতে পারে। যেমন—

- পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ অক্ষরেখাগুলো শনাক্ত করে খাতায় লেখো : (প্রতিটির মান ১)

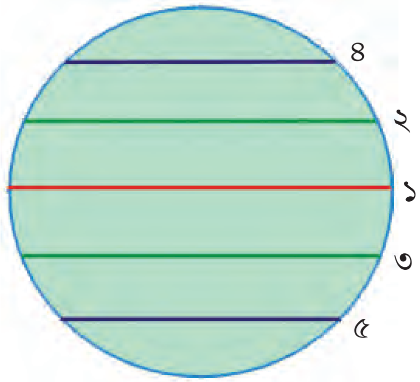

- নীচের ছবিটি দেখে ভারতের এই ধরনের অঞ্চলের ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ধারণা দাও। মানুষের জীবনযাত্রার এই প্রকার ভূপ্রকৃতি কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে সে সম্পর্কে তোমার মতামত ব্যক্ত করো। (২ + ৩)

শব্দছক সমাধান, শব্দের ধাঁধা, ধারণা মানচিত্র তৈরি, তথ্য মৌচাক পূরণ, বেমানান শব্দ শনাক্তকরণ (Odd one out), ভুল সংশোধন, 'আমি কে' (যেমন— আমি ভারতের মূল ভূখণ্ডের দক্ষিণতম বিন্দু। আমি কে?) ইত্যাদি ধরনের প্রশ্ন।

ষষ্ঠ শ্রেণির পর্ব বিভাজন

পর্ব - ১	পর্ব - ২	পর্ব - ৩
পাঠ একক/উপএকক	পাঠ একক/উপএকক	পাঠ একক/উপএকক
১. আকাশ ভরা সূর্য তারা	১. জল-স্থল-বাতাস	১. বায়ুদূষণ
২. পৃথিবী কী গোল	২. বরফে ঢাকা মহাদেশ	২. শব্দদূষণ
৩. তুমি কোথায় আছ	৩. আবহাওয়া ও জলবায়ু	৩. ভারতের কৃষিকাজ
৪. পৃথিবীর আবর্তন	৪. ভারতের জলবায়ু	৪. ভারতের জনজাতি
৫. ভারতের সাধারণ পরিচয়	৫. ভারতের মাটি	৫. মানচিত্র
৬. ভারতের ভূ-প্রকৃতি ও নদনদী	৬. ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিদ	
	৭. ভারতের অরণ্য ও বন্যপ্রাণী	

বিশেষ দ্রষ্টব্য : তৃতীয় পর্বভিত্তিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দেশিত পাঠ একক ছাড়াও প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব থেকে যথাক্রমে— তুমি কোথায় আছ, পৃথিবীর আবর্তন, আবহাওয়া ও জলবায়ু, ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশ পাঠ এককগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

তৃতীয় পর্বভিত্তিক মূল্যায়নে ৫ নম্বর মানচিত্র চিহ্নিতকরণ (ভারতের রেখা মানচিত্রে ভূপ্রাকৃতিক বিভাগ, প্রধান নদনদী, জলবায়ু অঞ্চল গ্রীষ্ম ও শীত মৌসুমি বায়ুর প্রবাহ পথ, মৃত্তিকা ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ অঞ্চল) আবশ্যিক করতে হবে।

শিখন পরামর্শ

ষষ্ঠ শ্রেণির ভূগোল বইটিতে মানবজীবন ও পরিবেশের মেলবন্ধন করা হয়েছে। বইটিতে শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতা, তার নিজস্ব চিন্তা ও চেতনার উন্মেষ ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। সহজ ভাষা, সহজ উদাহরণের সাহায্যে শিক্ষার্থীর বাড়ি, স্কুল, পাড়া, গ্রাম, শহর অর্থাৎ তার আশপাশের পরিবেশের সাথে ভূগোল বিষয়ের মূল ধারণার সংযোগসাধন করার জন্যই এই প্রয়াস—

শিক্ষক/শিক্ষিকার প্রতি—

- প্রাকৃতিক ও আঞ্চলিক ভূগোল বিভাগের প্রতিটি অধ্যায়ে মূল বিষয়ের ধারণা স্পষ্ট করার জন্য প্রচুর ধারণা মানচিত্র, আলোকচিত্র,সহজ মানচিত্র ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিটি শিক্ষার্থীর নিজস্ব অভিজ্ঞতা, অনুমান, সংস্কার, বিশ্বাসকে কাজে লাগাতে হবে।
- শিক্ষার্থীরা যখন আলোচনা করে সিদ্ধান্তে আসবে, আপনি মূল বিষয়ে প্রবেশ করবেন। প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর বিষয়গত ধারণা পরিষ্কার হয়েছে কিনা তা জানাবার পথ তৈরি করতে হবে। প্রশ্ন করে তাকে অপ্রস্তুত করে নয়, বরং গল্পের ছলে বা খেলার ছলে কাজটা করতে হবে।
- বইটিতে ‘অনুসন্ধান’, ‘সমীক্ষা’, এবং ‘হাতে কলমে’র উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর নিজস্ব পরিবেশ সচেতনতা এবং মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন করা। এই প্রসঙ্গে অন্য কোনো উদ্ভাবনী পরীক্ষানিরীক্ষাও করানো যেতে পারে।
- বইটির যেখানে যেখানে হাতেকলমে কাজ করার সুযোগ তৈরি করা আছে, শিক্ষার্থীদের সেগুলো করতে উৎসাহ দেবেন। শ্রেণিকক্ষে বা শ্রেণিকক্ষের বাইরে কাজগুলো করতে প্রয়োজন বুঝে সাহায্য করবেন।
- নিরবছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন করার জন্য নিজস্ব নোট-খাতা তৈরি করবেন। সেখানে শিক্ষার্থীর নামের সঙ্গে দুটি বা তিনটি পৃষ্ঠা রাখবেন। তাতে প্রতিদিন কিছু মন্তব্য লিখবেন। মন্তব্যগুলি একমাস বা দু-মাস অন্তর অভিভাবক/অভিভাবিকার সঙ্গে আলোচনা সভায় আলোচনা করবেন।
- দলগতভাবে শ্রেণিকক্ষে তথ্য ও ছবির কোলাজ তৈরি করে মূল বিষয় অনুধাবন করবে।
- আপনার সক্রিয় সহায়তা ছাড়া শিক্ষার্থীরা শিখনস্তর অতিক্রম করতে পারবে না ঠিকই, তবে শ্রেণিকক্ষে/শ্রেণিকক্ষের বাইরে আপনিই ‘মুখ্য’—এই ভাব প্রদর্শন কখনই করবেন না। শিক্ষার্থীকে স্বাধীনতা দেবেন, যাতে সে নিজেই বিষয়গুলোকে বুঝতে পারে।
- পিছিয়ে পড়াদের দিকে বিশেষ নজর দেবেন। যারা খুব সহজে শিখন স্তরে অগ্রসর হতে পারে, শুধুমাত্র তারা বুঝতে পারলেই নিশ্চিন্ত হবেন না। প্রতিটি শিক্ষার্থী যাতে সক্রিয়তাভিত্তিক শিখনে অংশগ্রহণ করে সেইদিকে নজর দেবেন।
- শিক্ষার্থীদের নিজস্ব পরিবেশেই যে ভূগোলের বিষয়বস্তু লুকিয়ে আছে তা উদ্ভাবন করার কাজে সাহায্য করবেন।
- আশপাশের পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করার জন্য শিক্ষার্থীদের বছরের কোনো একদিন কৃষিক্ষেত্র, জলাশয়, কারখানা, প্ল্যানেটোরিয়াম, আবহাওয়া অফিস, বিজ্ঞান উদ্যান বা সম্ভব হলে চিড়িয়াখানা, বনাঞ্চলে নিয়ে যাবেন। তারা ঘুরে এসে নিজস্ব প্রতিবেদন তৈরি করবে।
- শিক্ষার্থীদের কোনো কাজে ত্রুটি হলে সেটাকে ভুল বলবেন না। শিক্ষার্থীর ভুল ধারণাকে সঠিক ধারণায় নিয়ে যেতে হবে বাস্তব অভিজ্ঞতার উদাহরণ দিয়ে।